Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

আমি পদ্মজা - ৬১

ফরিনা পদ্মজার ঘরে প্রবেশ করে ঘাবড়ে গেলেন। বিছানায় রক্তাক্ত দীর্ঘদেহী একজন পুরুষ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়ে আছে। নাকি মরে গেছে? ফরিনা শিউরে উঠেন। পদ্মজা ফরিনাকে এক নজর দেখে জগ থেকে গ্লাসে জল নিয়ে ঢকঢক করে পান করল। ফরিনার মনে হচ্ছে বিছানায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত পুরুষ মানুষটি রিদওয়ান! যখন শতভাগ নিশ্চিত হলেন এটা রিদওয়ান, মনে তীব্র একটা ভয় জেঁকে বসে। তিনি নিঃশ্বাস আটকে পদ্মজার কাছে ছুটে আসেন। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন,'রিদু কি মইরা গেছে?'

পদ্মজা তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারলো না। সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে বলল,'মরেনি বোধহয়। তবে বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে মরে যাবে।'

পদ্মজার তরঙ্গহীন গলার স্বর ফরিনার ভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তিনি পদ্মজাকে আচমকা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। ফরিনার হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি টের পায় সে।
ফরিনা অস্থির হয়ে বললেন,'ও মা-
পদ্মজা ফরিনার বুক থেকে মাথা তুলে বলল,'কী হয়েছে আম্মা?'
ফরিনার চোখের দৃষ্টি অস্থির। তিনি ঢোক গিলে বললেন,'তুমি পলাইয়া যাও। আর আইবা না। রুম্পার মতো চইলা যাও।'
'আম্মা,ওরা আমাকে মারবে না। রিদওয়ান ভাইয়াই বলেছে।'
'মিছা কথা...মিছা কথা কইছে।'
'আম্মা,আপনি এমন করছেন কেন?'
ফরিনা দ্রুত সংজ্ঞাহীন রিদওয়ানকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর বললেন,'তুমি পলায়া যাও। তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কলিজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে কিন্তু...'

জুতার ছপছপ আওয়াজ শুনে ফরিনা থমকে যান। এরকম আওয়াজ মজিদের জুতোয় হয়। মনে হয় জুতায় পানি নিয়ে হাঁটছে। তিনি আতঙ্কে চোখ দুটি বড় বড় করে তাকালেন। মজিদ তো ঘরে ছিল না! কখন চলে এলো? আর যতক্ষণ মজিদ ঘরে থাকে ততক্ষণ ফরিনাকেও ঘরে থাকতে হয়। তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত মজিদ এখন পদ্মজার ঘরে আসবে। আর রিদওয়ানকে দেখে ফেলবে! তিনি পদ্মজার আলমারি খুলে তালা-চাবি বের করলেন। একটা ঝড় থামতেই যেন আরেকটা ঝড় শুরু হয়েছে। পদ্মজা ফরিনাকে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'আম্মা,কিন্তু কী? বাবু মানে উনাকে মেরে ফেলেছে মানে? আপনি কীভাবে জানেন? আম্মা...''

ফরিনা নিজের এক হাতে পদ্মজার এক হাত শক্ত করে চেপে ধরেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। বারান্দায় পা রাখতেই মজিদের সাথে দেখা হয়। ফরিনা মজিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে পদ্মজাকে টেনে নিয়ে যান তিন তলায়। মজিদ হতভম্ব হয়ে দেখলেন ঘটনাটা। পদ্মজা বার বার জিজ্ঞাসা করছে ফরিনাকে,'আম্মা,আপনি এটা কী বললেন! আমার বুক কাঁপছে। আম্মা কোথায় যাচ্ছেন?'

মজিদ পদ্মজার ঘরে উঁকি দিলেন। তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। বিছানার উপর রিদওয়ানকে দেখতে না পেলেও,রিদওয়ানের পা জোড়া চোখে পড়ে যায়। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাদর

সরিয়ে রিদওয়ানকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। এদিকে,ফরিনা পদ্মজাকে ঠেলে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেন। ঘরের দরজাটি লোহার। পদ্মজা ধাক্কা খেয়ে ঘরের মধ্যিখানে পড়ে। সে মেঝে থেকে উঠতে উঠতে ফরিনা বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। পদ্মজা আচমকার ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তার মাথায় বার বার বাজছে,তোমার আব্বা,ওই শকুনের বাইচ্ছা আমার নিষ্পাপ কইলজার টুকরা বাবুরে মাইরা ফেলছে!'

পদ্মজা দুই হাতে মুখ চেপে ধরে। মনে হচ্ছে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখুনি মারা যাবে। বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ফরিনা বলেছিলেন,সম্পত্তির জন্য হলেও আমিরকে ওরা জানে মারবে না! এজন্যই পদ্মজা ধৈর্য ধরে পাঁচটি দিন কাটাতে পেরেছে। ভেবেছিল, শরীরে একটু শক্তি জমিয়ে তারপর সে তার স্বামীকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু একটু আগে ফরিনা যা বললেন তাতে পদ্মজার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। রিদওয়ান শর্ত দিয়েছিল, পদ্মজা ঢাকা চলে গেলে আমিরকে ছেড়ে দিবে। পদ্মজা তাই মানতো। শুধু না করে আরেকটু কথা বের করতে চেয়েছিল সে। তার আগেই রিদওয়ান আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আর পদ্মজাও আঘাত করে বসে। পাঁচ দিনের সব ধৈর্য, পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেল ফরিনার এক কথায়। পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল,'আম্মা...আম্মা কেন আটকালেন আমাকে? দরজা খুলুন। আম্মা আপনার ছেলের কী হয়েছে? কী বললেন? আম্মা...'

ফরিনা হাতের চাবিটা দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। সিঁড়িতে শব্দ হচ্ছে দপদপ! তিনি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখেন,অস্বাভাবিকভাবে হাত কাঁপছে। কাঁপছে পা। মজিদ,খলিল একসাথে উঠে আসে। ফরিনার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফরিনা ভয়ে জমে গেছেন। মজিদের চেহারা ক্ষুদ্ধ। তিনি রাগে গজগজ করতে করতে প্রশ্ন করলেন,'রিদওয়ানকে পদ্মজা আঘাত করেছে?'
ফরিনা কিছু বললেন না। মজিদের গলার স্বর শুনে পদ্মজা চুপ হয়ে যায়। ফরিনা এলোমেলো দৃষ্টি নিয়ে কাঁপছেন। খলিল বললেন,'ভাবিরে জিগাও কেন? ওই ছেড়ি ছাড়া আর কার এতো সাহস আছে? এই ছেড়ি এই ঘরের ভিতরে?'
ফরিনা দরজার সাথে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। খলিলের প্রশ্ন শুনে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। মজিদ ফরিনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। দরজায় তালা! তখনই পদ্মজা দরজায় থাপ্পড় দিয়ে ডাকল,'আম্মা...আম্মা দরজা খুলুন। কী হচ্ছে ওখানে?'

মজিদের ক্ষুদ্ধ চেহারা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে। তিনি ফরিনার কাছে চাবি চাইলেন,'চাবি দাও। কি বলছি,কানে যায় না? চাবি দাও।'
ফরিনা আমতাআমতা করে বললেন,'ন...না-ই।'
মজিদ ফরিনার মুখ চেপে ধরেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন,'চাবি দাও।'
ফরিনা তাও বললেন,চাবি নেই। মজিদ আরো একবার বললেন,'চাবি দাও বলছি। শাড়ির কোন ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছো?'
'চাবি নাই। চাবি নাই আমার কাছে।' গলা উঁচিয়ে বললেন ফরিনা।

খলিল দরজায় জোরে কয়টা লাথি দিলেন। তালা ভাঙার চেষ্টা করলেন। দুপদাপ শব্দ! সেই সাথে পদ্মজাকে উদ্দেশ্য করে নোংরা গালি। খলিলের মুখের ভাষা শুনে পদ্মজার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে যায়। ফরিনার উঁচুবাক্য শুনে মজিদ হাওলাদার রাগে কাঁপতে থাকলেন। ফরিনার এতো সাহস কবে হলো! তিনি ফরিনার শরীর হাতড়ে চাবি খুঁজতে খুঁজতে বললেন,'চাবি কোথায় রাখছো? জলদি বলো। নয়তো এরপর যা হবে,ভালো হবে না।'

Kobitor.com

ফরিনার শরীর কাঁপছে ভয়ে। তিনি জানেন,এই মুহূর্তে তিনি খুন হয়ে যেতেও পারেন। তবুও চাবি দিবেন না। নয়তো ওরা পদ্মজাকে খুন করে ফেলবে। ওরা পারে না এমন কিছু নেই! মজিদের নিকৃষ্ট অনেক কাজের সাক্ষী তিনি। এই মানুষটা তার জীবনের জাহান্নাম। মজিদ রাগে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফরিনা কিছুতেই কথা মানছে না বলে, ছোট ভাইয়ের সামনে ফরিনার শাড়ি টেনে খুলে ফেললেন তিনি। আর বললেন,'চাবি কোন চিপায় রাখছো? বলো,নয়তো মেরে পুঁতে ফেলবো।'

ফরিনা টু শব্দও করলেন না। খলিলের সামনে যুবতীকালে তাকে বিবস্ত্র করেও মজিদ মেরেছে! সম্মান-ইজ্জত কবেই হারিয়ে গেছে। নতুন করে হারানোর কিছু নেই। বয়সও অনেক হয়েছে! তবে এদের শিকার পদ্মজাকে হতে দিবেন না কিছুতেই। মজিদ কোনোভাবেই ফরিনার কাছ থেকে চাবি উদ্ধার করতে পারেননি। এদিকে রিদওয়ানের অবস্থা খারাপের দিকে। খলিল দ্রুত নিচে চলে গেলেন। মজিদ ফরিনাকে মেঝেতে ফেলে ইচ্ছেমত লাথি,থাপ্পড় দেন,সাথে বিশ্রি গালিগালাজ। চারপাশ ফরিনার কান্নায় ভারী হয়ে উঠে। ফরিনার কান্নার স্বর পদ্মজার কানে আসতেই সে চিৎকার করে বলল,'আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আব্বা...দোহাই লাগে। আম্মা লাশের মতো হয়ে গেছে। আব্বা,আম্মাকে মারবেন না। আমাকে মারেন। আব্বা। আম্মা আপনি দরজা খুলুন। আম্মাকে এভাবে কেন মারছেন আব্বা ? আপনি তো অলন্দপুরের ফেরেশতা ছিলেন আব্বা। আপনার এমন রূপ কেন? আম্মা দরজা খুলুন। আব্বা,আম্মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। অনুরোধ করছি,আর মারবেন না।'

বাইরে ফরিনার কান্না,ঘরের ভেতর পদ্মজার কান্না। আর দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড়ের আওয়াজ। সব মিলিয়ে চারপাশ যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। খলিলের ডাক শুনে মজিদ চলে গেলেন। কিন্তু যাওয়ার পূর্বে ফরিনার পেটে বড় একটা লাথি বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরিনার মুখ দিয়ে বমি বেরিয়ে আসে। মজিদ চলে যাওয়ার মিনিট দুয়েক পর লতিফা দৌড়ে আসে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় সে দুইবার হোঁচট খেল। তারপর ফরিনার মাথা নিজের কোলে নিয়ে কেঁদে বলল,'খালাম্মা আপনি কেন খালুর বিরুদ্ধে গেলেন। ও খালাম্মা কথা কন। খালাম্মা?'

লতিফার ব্যকুল কণ্ঠস্বর শুনে পদ্মজা আরো জোরে থাপ্পড় দিল দরজায়। বলল,'লুতু বুবু আম্মার কী হয়েছে? লুতু বুবু দরজা খুলো। ও লুতু বুবু।'
ফরিনা অস্পষ্ট স্বরে লতিফাকে বললেন,'তোর খালু চইলা গেছে?'
'হ,গেছে।'
'বাড়ি থেইকা বাইর হইছে?' ফরিনার কণ্ঠ নিভে আসছে।
লতিফা ফরিনার মাথাটা সাবধানে মেঝেতে রেখে বারান্দা থেকে বাইরে উঁকি দিল।
মজিদ,খলিল,মদন আর বাড়ির দারোয়ান মিলে গরু গাড়ি দিয়ে রিদওয়ানকে নিয়ে যাচ্ছে।
গেইটের কাছাকাছি চলে গেছে। সে ফরিনাকে এসে বলল,'বাইর হইয়া গেছে খাল্লাম্মা।'
পদ্মজা দরজায় এলোপাথাড়ি থাপ্পড় দিচ্ছে। বিকট শব্দ হচ্ছে! ফরিনা আঙ্গুলের ইশারায় ডান দিকটা দেখিয়ে বললেন,'ওইহানে খুঁইজা দেখ,চাবি পাবি একটা। দরজাডা খুইলা দে।'

লতিফা ফরিনার কথামতো চাবি খুঁজল। পেয়েও গেল। তারপর দরজা খুলতেই পদ্মজা হুড়মুড়িয়ে বের হয়। ফরিনাকে দেখে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। গায়ে শাড়ি নেই। পেটিকোট হাঁটু অবধি তোলা। মিষ্টি রঙের ব্লাউজে রক্তের দাগ। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। দুই চোখ ফুলে গেছে। হাতে,পায়ে

জখম। বয়স্ক মানুষটাকেও ছাড়েনি! পদ্মজা হাঁটুগেড়ে বসে ফরিনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল,'
আম্মা,আপনি কেন চাবিটা দিলেন না? এরা মানুষ? নিজের বউকে কেউ এভাবে মারে? লুতু বুবু
আম্মাকে ধরো।'
লতিফা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল,'পদ্মজা তুমি কিচ্চু জানো না। খালু এমনেই
মারে।'
'এখন ধরো আম্মাকে।'
লতিফা,পদ্মজা দুজন মিলে ফরিনাকে ধরে ধরে তিন তলার আরেকটি ঘরে নিয়ে যায়। যে ঘরটিতে প্রথম রুম্পা ছিল,তারপর রানি। নিচ তলা অবধি নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফরিনা মেঝেতে পা সোজা করে ফেলতে পারছেন না। চোখ দুটি বার বার বুজে যাচ্ছে। পদ্মজা একটা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করছে। যেমনটা তার মায়ের মৃত্যুর আগে অনুভব হয়েছিল। পদ্মজার গা কেঁপে উঠে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। মনে মনে কেঁদে বলল,'আল্লাহ! কেন আমার সাথে এমন হচ্ছে! কীসের পরীক্ষা নিচ্ছো তুমি? আমার চারপাশ এতো নির্মম কেন? কোথায় আছো আম্মা। কোথায় আছেন পারিজার আব্বু। আমি ভীষণ একা। ভীষণ।'

পদ্মজার হেঁচকি উঠে গেল। সে ঢোক গিলে নিজেকে সামলায়। ফরিনার যত্ন নিতে হবে তার। ফরিনাকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই তিনি থেমে থেমে বললেন,'আমার কৈ মাছের জান। আমি মরতাম না। তুমি,তুমি পলায়া যাও।'
'আম্মা,আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। লুতু বুবু হালকা গরম পানি,আর আমার ঘরের আলমারির ডান পাশের ড্রয়ার থেকে স্যাভলন আর তুলা নিয়ে আসো।'

পদ্মজার আদেশ পাওয়া মাত্র লতিফা বেরিয়ে গেল। ফরিনা করুণ চোখে পদ্মজার দিকে চেয়ে বললেন,'কান্দো কেরে? কাইন্দো না।'
পদ্মজার সুন্দর দুটি চোখে জলের পুকুর। বিরতিহীনভাবে পানি গড়িয়ে পড়ছে গলায়,বুকে। সে ফরিনার এক হাতে কপাল ঠেকিয়ে হতাশ হয়ে ব্যর্থ কণ্ঠে বলল,'আম্মা,আমি কী করব? যখনই ভাবি এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই ভয়ংকর সব ঘটনার সম্মূখীন হতে হয়। আমি আর পারছি না। এতো খারাপ পরিবেশ আমি আর নিতে পারছি না আম্মা। নিজেকে কিছুক্ষণ আগেও শক্তিমান মনে হয়েছে। মনে হয়েছে,আমি চাইলে সব পারব। কিন্তু এখন খুব দূর্বল মনে হচ্ছে। আমি ওদের বিরুদ্ধে পেরে উঠছি না। আপনি ভালো হয়ে উঠুন আম্মা। আপনার ছেলে কি সত্যি-''

পদ্মজা তাকিয়ে দেখল, ফরিনার চোখ বোজা অবস্থায় আছে। পদ্মজার বুক ছ্যাঁত করে উঠল। সে ফরিনার নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করল,নিঃশ্বাস নিচ্ছে নাকি। নিঃশ্বাস নিচ্ছে! সেই সময় লতিফা স্যাভলন,তুলা,আর হালকা গরম পানি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

ফরিনা ঘুমাচ্ছেন। কথা বলার অবস্থায় নেই। পদ্মজার পায়ে ঘা হয়েছে। পাঁচদিনে কি ছেঁড়াকাঁটা ভালো হয়? শীতের কারণে উলটো আরো কষ্ট বাড়ে। পায়ের অবস্থা যা তা! তাতে অবশ্য যায় আসে না পদ্মজার। সে অস্থির হয়ে আছে। বুকে এক ফোঁটাও শান্তি নেই। রিদওয়ান দুপুরে জঙ্গল থেকে ফিরেছিল। পদ্মজার ধারণা,আমির জঙ্গলের কোথাও বন্দি আছে। অথবা লাশটা হলেও আছে! ভাবনাটা পদ্মজার মাথায় আসতেই সে দ্রুত মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে,' না! আমি কী ভাবছি! কিছু হয়নি। কারো কিছু হয়নি। সবাই ভালো আছে।'

Kobitor.com

সে লতিফার দায়িত্বে ফরিনাকে রেখে নিচ তলায় নেমে আসে। সাথে ছুরি,রাম দা নিয়েছে। আজ খোঁপা করেনি। বেণী করেছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। সব হাসপাতালে। ওরা ফিরলে সে আর আস্তো থাকবে না। তার আগেই আমিরকে বের করতে হবে। সেই সাথে লুকোনো গুপ্ত রহস্য। সদর ঘরে আমিনা ছিলেন। তিনি আলোকে খিচুরি খাওয়াচ্ছেন। নির্বিকার ভঙ্গি! কোনো তাড়া নেই,চিন্তা নেই! রিদওয়ানের অবস্থা কী দেখেনি? এই মানুষটা শুধু রানির জন্যই কাঁদেন। আর কারোর জন্য না! কিন্তু কেন? পরিবারের সবার সাথে দূরত্ব বজায় রাখেন। যদিও কথা বলেন,তা অহংকারী, কটু কথা। পদ্মজা বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার নামায পড়েই বেরিয়েছে। আজ জঙ্গলে মরবে নয়তো আগামীকাল এই বাড়ির পুরুষগুলোর হাতে! সে মনে মনে মৃত্যু মেনে নিয়েছে। ধীর পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢুকে। বোনদের কথা খুব মনে পড়ছে। সে মারা গেলে, ওদের কী হবে? খুব কী কাঁদবে? কাঁদতে কাঁদতে জ্বর উঠে যাবে বোধহয়! পূর্ণার তো খুব কান্নার পর জ্বর হয়। প্রেমা নিজেকে সামলাতে পারবে। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় পদ্মজা মানুষের উপস্থিতি টের পেলো। ফিসফিসিয়ে কাছে কোথাও কেউ কথা বলছে। পদ্মজা এখনও ভালো করে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করেনি। সে হিজল গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে দুটি মানুষ চোখের পর্দায় ভেসে উঠে। তারা জঙ্গলের পশ্চিম দিক থেকে এসেছে। অস্পষ্ট তাদের মুখ। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অন্দরমহলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। একটা মুখ চিনতে পারে পদ্মজা। মৃদুল! মৃদুলের হাতে টর্চ। সেই টর্চের আলোতে পাশের জনের হাত ভেসে উঠে। এক হাতে লাল তাজা রক্ত, অন্য হাতে রামদা। পদ্মজা শিউরে উঠে। ঘামতে থাকল। উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার উপক্রম। গলা শুকিয়ে কাঠ। মৃদুল কিছু একটা বলে। উত্তরে আগন্তুক কিছু একটা বলে। ঝাপসা আলোয় মৃদুলের সাথের লোকটার দেহ আর চুল স্পষ্ট হয়। লম্বা শরীর,মাথায় ঝাকড়া চুল। চারপাশ থমকে যায়। পদ্মজার শরীর বেয়ে যেন মুহূর্তে শীতল কিছু একটা ছুটে যায়। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে পারছে না।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ
(আমাদের সমাজে অহরহ অনেক নোংরা ঘটনা ঘটছে! সেরকম অনেক দৃশ্য এই উপন্যাসে চলে আসবে। চরিত্রের প্রয়োজনে! আশা করি,এসব নিয়ে কেউ অভিযোগ তুলবেন না। আমি পদ্মজা থ্রিলারধর্মী উপন্যাস।)

আমি পদ্মজা - ৬২

____

চন্দ্র তারকাহীন ম্লান আকাশের কারণে চারপাশ অদ্ভুত ভয়ংকর হয়ে আছে। পদ্মজার মুখ ঘেঁষে একটা পাতা মাটিতে পড়লো। সাথে সাথে সে ভয় পেয়ে দুই পা পিছিয়ে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, নিজের ভয় পাওয়া দেখে নিজের উপর খুব বিরক্ত হয়। দুই পা এগিয়ে এসে অন্দরমহলের পিছনে তাকায়। আধো অন্ধকারে আবিষ্কার করলো, মৃদুল এবং আগন্তুক নেই! চোখের পলকে যেন মুহূর্তেই ভোঁজবাজির মতো নাই হয়ে গেল! পদ্মজার মস্তিষ্ক সাবধান হয়ে উঠলো। মৃদুলের মধ্যে ঘাপলা আছে ভাবতেই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সে সবকিছু ভাবতে পারে। সবকিছু! পদ্মজা তার পরিকল্পিত পথ ধরে হাঁটা শুরু করলো। মনে মনে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, মৃদুল জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেনি তো? আর দীর্ঘদেহী, ঝাঁকড়া চুলের আগন্তুকও কি সাথে রয়েছে? পদ্মজা এক হাতে ছুরি নিল, অন্য হাতে রাম দা। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর। চারপাশে চোখ বুলিয়ে সাবধানে এক পা,এক পা করে এগোচ্ছে। নিঃশ্বাস যেন আটকে

আছে। এই বুঝি কেউ আক্রমণ করে বসল! সেদিন যতটুকু এসেছিল সে,ঠাওর করে করে নিরাপদভাবে ঠিক ততটুকুই চলে আসে পদ্মজা। সামনে বড় বড় গাছপালা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভূতুড়ে পরিবেশ। পদ্মজা কেন জানি নিশ্চিত,আজও কেউ থাকবে এখানে, অজানা রহস্যজাল পাহারা দেয়ার জন্য। আর আশেপাশেই আছে সেই গুপ্ত রহস্যজাল। পদ্মজার শিরায়,শিরায় প্রবল উত্তেজনা বয়ে যায়। কয়েকটা গাছ পেরিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। একটা শব্দ ভেসে আসছে কানে। পদ্মজা দুরু দুরু বুকে শব্দ্যোৎস লক্ষ করে তাকাল। কিছুটা দূরে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে। সম্ভবত প্রস্রাব করছে। পদ্মজা প্রস্তুত হয় লোকটিকে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু অগত্যা কারণে তার হাত কেঁপে উঠলো। সে কাউকে প্রাণে মারতে পারবে না। সেই সাহস হচ্ছে না। একটা খুন করেছে ভাবলেই তার গাঁ কেঁপে উঠে। সেদিনের খুনটা তার নিজের অজান্তেই হয়ে গিয়েছে। সে যেন ছিল অন্য এক পদ্মজা। সেই পদ্মজাকে সে নিজেও চিনতো না।
পদ্মজা অস্থির হয়ে কিছু একটা খোঁজে। লোকটা উঠে দাঁড়ায়। পদ্মজা দ্রুত একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। লোকটির মুখ অস্পষ্ট। অবয়ব শুধু স্পষ্ট। দুলকি চালে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে লুঙ্গি ও সোয়েটার পরা। মাথায় টুপিও রয়েছে। লোকটার হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে না, সে টের পেয়েছে অন্য কারো উপস্থিতি। তবুও পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে যায়। সে রাম দা শক্ত করে ধরলো। লোকটি তার কাছে আসতেই সে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। লোহার রাম দার এক পাশের আঘাতে লোকটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গোঙানির শব্দ করে, হাত পা ধাপড়াতে থাকলো। সেকেন্ড কয়েক পরই দেহ নিস্তেজ হয়ে যায়। পদ্মজার বুক ফুঁড়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তবে লোকটাকে কাঁচা খেলোয়ার মনে হলো! এক আঘাতেই কুপোকাত! পদ্মজা একবার ভাবল,টর্চের আলোয় লোকটার মুখ দেখবে। তারপর মাথায় এলো,টর্চের আলো দেখে যদি ওত পাতা বিপদ তার উপস্থিতি টের পেয়ে এগিয়ে আসে! তাই আর টর্চ জ্বালাল না। সে নিথর দেহটিকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। বাতাসের সাঁ,সাঁ শব্দ,ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,আর অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা, আর রাতের অন্ধকার বার বার পদ্মজার গা হিম করে দিচ্ছে। পদ্মজা প্রমোদ গুণে নিজের মধ্যে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে। বড় বড় গাছপালা ফেলে সে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে কোনো বড় গাছ নেই। জঙ্গলের মাঝে এরকম খোলা জায়গা কেন? এতে কি কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে! একদমই খোলা তাও নয়। জংলি লতাপাতা রয়েছে। তবে একটু অন্যরকম। লতাপাতার মাঝে জোঁক বা কোনো বিষাক্ত জীব থাকতে পারে। বিপদের কথা ভেবেও পদ্মজা ঝুঁকি নিলো। সে পা বাড়াল সামনে। কয়েক কদম এগোতেই জুতা ভেদ করে কাঁটা ফুঁটে পায়ে! আঘাতে আবার আঘাত লেগেছে। ব্যথায় পদ্মজার কলিজা যেন ছিঁড়ে যায়। সে কাঁটা বের করার চেষ্টা করে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল বেরোয়। রক্তজবা ঠোঁট দুটি জলে ভিজে যায়।

মৃদুল এদিকওদিক দেখে বলল,'লিখন ভাই, চলো চইলা যাই।'
অসহনীয় যন্ত্রনায় লিখনের কপালে বিন্দু,বিন্দু ঘাম জমেছে। সেসবকে তোয়াক্কা করে সে বলল,'পদ্মজার খোঁজ নিতে হবে আগে।'

মৃদুল বুঝতে পারছে না কি করবে সে! লিখনের হাত থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। দুপুরে সে পূর্ণার সাথে দেখা করতে মোড়ল বাড়িতে গিয়েছিল। পূর্ণা চোখমুখ ফুলে যা তা অবস্থা। অনেক কান্নাকাটি করে পদ্মজার জন্য। পূর্ণা আশঙ্কা করছে,তার বোন ভালো নেই। মৃদুলেরও তাই মনে হয়। সে যেতেই পূর্ণা ঝরঝর করে কাঁদতে থাকল। তখন লিখন শাহ আসে। তার শুটিং শেষের

দিকে। সপ্তাহখানেক পর ঢাকা ফিরবে। তাই পূর্ণাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। পূর্ণাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে লিখন বিচলিত হয়ে পড়ে। তারপর প্রশ্ন করে বিস্তারিত জানতে পারে। লিখন,হাওলাদার বাড়িতে আসতে চাইলে,মৃদুল না করলো। সে বললো,ঢুকতে দিবে না। লিখন মৃদুলের কথা শুনে না। চলে আসে হাওলাদার বাড়িতে। পিছু পিছু আসে মৃদুল। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত দারোয়ান গেইটের ভেতরেই ঢুকতে দিল না লিখনকে। তখন মৃদুল, লিখনের সাথে পরিকল্পনা করলো, তারা বাড়ির পিছনের ভাঙা প্রাচীর পেরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবে। লিখন প্রথম রাজি না হলেও,পরে রাজি হলো। সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পদ্মজার খোঁজ নেই কথাটা সে ভাবতেই পারছে না! এতো বয়সে এসেও সে একটা মেয়ের জন্য এতো ব্যকুল হয়ে পড়ছে! তাও বিবাহিত মেয়ে! এমন মেয়েকে ভালোবেসে ব্যকুল হওয়া তো সমাজের চোখে খারাপ। এই সমাজের জন্যই সে পদ্মজার থেকে নিজের এতো দূরত্ব রাখে। যাতে কোনো খারাপ কথা,কোনো দূর্নাম পদ্মজাকে ছুঁতে না পারে। পদ্মজা যেন অসুখী না হয়। সেই পদ্মজার নাকি চারদিন ধরে খোঁজ নেই! মৃদুল দেখা করতে চাইলে,তাও করতে দেয়া হচ্ছে না! লিখনের মাথার রগরগ দপদপ করতে থাকে। আঁধার নামতেই দুজনে হাওলাদার বাড়ির পিছনের ভাঙা প্রাচীর দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ে। বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল,সেই জঙ্গলসহ পুরো বাড়ির সীমানা মিলিয়ে চারিদিকে গোল করে প্রাচীর দেয়া। তাই পিছনের প্রাচীর দিয়ে তারা আগে পশ্চিম দিকের জঙ্গলে পা রাখে। মৃদুল একবার মদনের সাথে পশ্চিম দিকে এসেছিল। একটা ঔষধি পাতা নিতে। তাই সে জানতো,এদিকে বড় বড় কাঁটা আছে। যা পথ রোধ করে। এজন্য সে রামদা নিয়ে এসেছে। যা লিখনের হাতে ছিল। লিখন অসাবধানবশত কাঁটার লতাপাতা কাটতে গিয়ে নিজের হাতে আঘাত করে বসে। ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে। গলগল করে বেরিয়ে আসে রক্ত। রক্তাক্ত হাত নিয়ে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। মৃদুল চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল,'ভাই, রক্ত তো বন্ধই হইতাছে না।'

'কী করা যায় বলোতো?'

'আসো চইলা যাই। বাজারে যাইবা। নয়তো ডাক্তারের বাড়িতে নিয়া যাব।'

'ব্যস্ত হয়ো না মৃদুল।'

লিখন এক জায়গায় বসল। তারা অন্দরমহলের বাম দিকে আছে। মৃদুলের হাত থেকে টর্চ নিয়ে লিখন চারিদিকে কিছু দেখল। তারপর বলল,'ওইযে দেখা যাচ্ছে,ওই পাতাটা নিয়ে আসো।'

'আচ্ছা,ভাই। '

মৃদুল লিখনের দেখানো কয়েকটা পাতা নিয়ে আসে। তারপর কচলে নরম করে লিখনের ক্ষতস্থানে লাগায়। লিখন বলল,'হয়েছে এবার। রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমরা চইলা যাইলেই পারতাম।'

'পদ্মজার খোঁজ না নিয়ে কীভাবে যাই?'

'পদ্মজা ভাবিরে এতো ভালোবাসো ভাই,অবাক করে আমারে।'

লিখন মুচকি হেসে বলল,'এসব বলো না মৃদুল। এসব বলতে নেই।'

'সত্যি কথা কইতে ডর কীসের?'

লিখন ঠোঁটে হাসি রেখেই উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে বলল,'বিবাহিত নারী নিয়ে এসব বলতে নেই। সমাজ ভালো চোখে দেখে না।'

'সমাজরে আমি জুতা মারি।'

'তোমার বয়স বেড়েছে ঠিকই,জ্ঞান হয়নি।' বলতে বলতে লিখন অন্দরমহলের পিছনে এসে দাঁড়াল। গা হিম করা ঠান্ডা বইছে। তার পরনে শীতবস্ত্র নেই। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে সে। মৃদুল বলল,'এই কথা আমার আম্মাও বলে।'

'এসব কথা বাদ দাও এখন। শুনো,আমরা বাড়ির সামনে যাব নাকি পিছন থেকেই কিছু করব?'

লিখনের ভাবগতি বোঝা যাচ্ছে না। মৃদুল লিখনের দৃষ্টি অনুকরণ করে অন্দরমহলের দুই তলায় তাকাল। পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে। প্রশ্ন করলো,'পিছনে কী করার আছে?'
'পদ্মজার ঘরের জানালার পাশে রেইনট্রি গাছটা দেখেছো? গাছে উঠে উঁকি দিলেই পদ্মজাকে দেখা যাবে। কথা বলাও যাবে।'
'উঠতে পারো গাছে?'
'আরে পুরুষ মানুষ হয়েছি কীজন্যে?'
'তাইলে গাছে উঠমু আমরা?'
'একবার সামনে দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। তুমি যাও,গিয়ে দেখো ঢুকতে দেয় নাকি।'
মৃদুল মুখ কালো করে বললো,'দিবে না। আবার অপমান হতে ইচ্ছা করতাছে না।'
'তাহলে চলো গাছে উঠি।'
মৃদুল চুল ঠিক করতে করতে গুরুতর ভঙ্গিতে বলল,'তুমি যহন কইছো, আমি যাবো।'

লিখন হাসলো। পূর্ণার মতোই মৃদুলের স্বভাব। পূর্ণাকে যে কারণে ভালো লাগে,ঠিক একই কারণে মৃদুলকেও ভালো লাগে। মৃদুল চলে যায়। লিখনের মাথাটা ব্যথা করছে। সে দু হাতে কপালের দু পাশ চেপে ধরে পদ্মজার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে ভাবে, একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হয়ে এভাবে প্রাচীর ডিঙিয়ে,লুকিয়ে এক পাক্ষিক ভালোবাসার মানুষের খোঁজ নিতে আসাটাকে হয়তো কারো চোখে পাগলামি মনে হবে। কিন্তু তার চোখে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব! নিজেকে ভালো রাখার দায়িত্ব! পদ্মজা ভালো আছে ভেবেই সে মানসিকভাবে ভালো থাকে। এ কথা ঠিক, পদ্মজার সাথে আমিরের এতো সুখ দেখে তার বুকে চিনচিন ব্যথা হয়। তবে এটাও ঠিক পদ্মজার সুখ দেখে সে শান্তিও পায়! বেঁচে থাকার মানসিক মনোবল পায়। আশা থাকে মনে, আছে! বেঁচে আছে পদ্মফুল! চাইলেই দূর থেকে দেখা যাবে। চাইলে কথা বলাও যাবে। কিন্তু যদি নাই বা থাকে? তবে-

মৃদুল এসে জানালো,'শালার ব্যাঠা দুলাভাই নাই। কেউই নাই দরজার সামনে।'
লিখন বলল,'তাহলে চলো। সামনে দিয়েই যাই। আমারও কেমন লাগছিল,এভাবে লুকিয়ে বাড়ির পিছন দিয়ে... " লিখন হাসলো। ম্লান হাসি। সে এগিয়ে গেল। সাথে মৃদুল। দুজন অন্দরমহলে প্রবেশ করলো নির্বিঘ্নে। কোনো বাধা আসেনি। আমিনা সদর ঘরে বসে ছিলেন। তিনি লিখনকে দেখে বললেন,'তুমি এইহানে কেরে আইছো?'
মৃদুল ঘরে ঢুকে বলল,'ফুফুআম্মা,পদ্মজা ভাবি কই?'
আমিনা বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। মৃদুলের কাছে এসে আদুরে গলায় বললেন,'কই আছিলি বাপ? তোর ফুপায় বকছে বইলা চইলা যাবি কেন? আমি তোর ফুফুআম্মা আছি না? তুই এইহানেই থাকবি। যতদিন ইচ্ছা থাকবি।'
মৃদুল কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করে বলল,'ধুর! বাদ দেও এসব কথা। তোমার জামাই একটা ইবলিশ। ইবলিশের ধারেকাছে মানুষদের থাকতে নাই।'
আমিনা মৃদুলের মুখ ছুঁয়ে বললেন,'এমন কয় না বাপ।'
'আদর পরে কইরো। এখন কও তো পদ্মজা ভাবি কই?'
'ঘরেই আছে।'
'ভাবির কি শরীর ভালা আছে?'
আমিনা ক্ষণমুহূর্ত সময় নিয়ে লিখনকে দেখলেন। তারপর বললেন,'হ ভালা।'
'আচ্ছা,ফুফুআম্মা আমরা উপরে যাইতাছি।'
আমিনা লিখনের দিকে আঙ্গুল তাক করে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন,'এই ছেড়াও যাইবো?'

লিখন চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। পরপুরুষ হয়ে পদ্মজার মতো মেয়েকে দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না বোধহয়। মৃদুল তো এই বাড়ির আত্মীয়। সে গেলে সমস্যা নেই। মৃদুল কিছু বলার পূর্বে লিখন বলল,'আমি এখানে বসি। তুমি যাও।'
'না ভাই,তুমি আইয়ো।'
'আরেএ,মৃদুল যাও তো।'

মৃদুল সিঁড়িতে পা রাখলো। আমিনা ভাবছেন,পদ্মজা তো ঘরেই আছে। বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই। এরকম সময়ে যদি পদ্মজার নিচে নেমে আসে? লিখনের সাথে কথা বলে! আর এ খবর কোনোভাবে খলিল হাওলাদারের কানে যায়। তবে তার রক্ষে নেই। তিনি উঁচুকণ্ঠে ডাকলেন,' মৃদুলরে?'
মৃদুল তাকালো। আমিনা জানেন না,পদ্মজা সত্যি যে ঘরে নেই। তিনি মিথ্যে ভেবে বললেন,'পদ্মজায় তো ঘরে নাই।'
লিখন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলো,'কেন? কোথায় গিয়েছে?'
আমিনা নির্বিকার কণ্ঠে বললেন,'আমি কিতা কইতাম? গেছে কোনো কামে।'
মৃদুল সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসলো,'ভাবি একলা গেছে?'
আমিনা আরেকটা মিথ্যা বললেন,'না,একলা যায় নাই। আমিরের লগে গেছে?'
মৃদুল উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো,'আমির ভাই বাড়িত আছিলো? আমি যে দেহি নাই। ভাবছি,জরুরি কোনো কামে ঢাকাত গেছে।আচ্ছা,ফুফুআম্মা অন্দরমহল নজরবন্দিতে আছিলো কেন? আমারে ঢুকতে দিতো না।'
আমিনা তৃতীয়বারের মতো মিথ্যে বললেন,'আমির তো ঢাকাতই গেছিলো। কাইল রাইতে আইছে। আমির নাই এজন্যে পদ্মজার-'
লিখন কথা কেড়ে নিয়ে বলল,'বুঝতে পেরেছি। সিকিউরিটি মানে নিরাপত্তা দিয়ে গিয়েছিল। আমি আছিতো গ্রামে! আমির হাওলাদার খুব ভালোবাসেন পদ্মজাকে!' শেষ শব্দ তিনটি লিখন জোরপূর্বক হেসে বলল। তার চোখের মণি চিকচিক করছে। মৃদুল আফসোস করে বললো,'ধুর,দেখা হইলো না।'
'আসি চাচি।' বললো লিখন।

মৃদুল,লিখন বেরিয়ে আসে। মৃদুল বললো,'পদ্মজা ভাবির চিঠি দেখে তো মনে হয় নাই এতো সহজ ব্যপার।'
'হু। পদ্মজা একটা রহস্যময়ী,মায়াময়ী। তাই বোধহয় রহস্য রেখে চিঠি লিখেছে। আর,মিস্টার আমির যেহেতু এখন সাথে আছে নিশ্চয় পদ্মজা ভালো আছে।'
মৃদুল গভীর মগ্ন হয়ে কিছু ভাবছে। সে লিখনের কথার জবাবে বললো,' উমম।'
'তবুও, আগামীকাল পদ্মজা পূর্ণার সাথে যোগাযোগ না করলে আমরা আবার আসব না হয়।'
মৃদুল লাফিয়ে উঠে বলল,'এটাই ভাবছিলাম।'

লিখনের হাতের রক্তপড়া বন্ধ হলেও খুব ব্যথা হচ্ছে। তা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মৃদুল বললো,'ভাই,সাইকেল নিয়া আসি। এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া ঠিক হইব না।'

লিখনও সায় দিল। মৃদুল আলগ ঘর থেকে সাইকেল নিয়ে আসে। মৃদুল সামনে, লিখন পিছনে বসলো। তাদেরকে দারোয়ান দেখে অবাক হয়। তবে বেশিকিছু বলতে পারেনি,মৃদুল হুমকি-ধামকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতের স্নিগ্ধ বাতাসে লিখন অনুভব করলো,তার বুকের সূক্ষ্ম ব্যথাটা

Kobitor.com

সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। সে একবার ঘুরে তাকাল হাওলাদার বাড়ির গেইটের দিকে! খ্যাতিমান, সুদর্শন, ধনী লিখন শাহ, যে সবসময় ঠোঁটে প্লাস্টিকের হাসি ঝুলিয়ে রাখে তাকে দেখে সবার কত সুখী মনে হয়! কত যুবক স্বপ্ন দেখে লিখন শাহর অবস্থানে আসার! কিন্তু তারা কী কখনো জানবে, লিখন শাহ সর্বক্ষণ বুকের ভেতর বিষাক্ত সূচ নিয়ে হাসে। যে সূচের তীব্রতা তাকে এক মুহূর্তও শান্তি দেয় না।

পদ্মজা চারিদিকে হাঁটছে। কিন্তু চোখে পড়ার মতো কিছু পাচ্ছে না। কী এমন আছে এখানে? যা পাহারা দেয়ার জন্য কেউ না কেউ থাকে। কিছুই তো নজরে আসছে না। পদ্মজা জংলি লতাপাতার উপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে আসে। শিশিরের জলে পায়ের তালু থেকে হাঁটু অবধি ভিজে গিয়েছে। পা জোড়া ঠান্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। থেকে থেকে কাছে কোথাও শেয়াল ডাকছে। পদ্মজার বুক ধুকপুক,ধুকপুক করছে।
মনে হচ্ছে,কয়েক জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে। ছিঁড়ে খাবে দেহ! ভাবতেই,পদ্মজার গা শিউরে উঠলো। সে ঢোক গিলল। তারপর আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিল। আয়তুল কুরসি যতবার সে পড়ে,ততবার নিজের মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করে। ভরসা পায়। এই মুহূর্তেও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। সে সামনে এগোতে এগোতে একসময় আবিষ্কার করলো,তার পায়ের নিচে মাটির বদলে অন্যকিছু আছে! চকিতে পদ্মজার মস্তিষ্ক চারগুণ গতিতে সচল হয়ে উঠলো। সে পায়ের নিচের লতাপাতা সরাতে গিয়ে দেখল, এই লতাপাতাগুলোর শেকড় নেই! পদ্মজা দ্রুতগতিতে সব লতাপাতা সরালো। তখনই আবছা আলোয় চোখে ভেসে উঠলো,লোহার মেঝে! পদ্মজার মুখে একটি গাঢ় বিস্ময়ের ছাপ প্রতীয়মান হয়ে উঠলো। তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। শীতল শরীর উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করলো। লোহার মেঝেটা খুব একটা বড় নয়। পদ্মজা টর্চ জ্বালায়। খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে দেখে। এক পাশে ছিদ্র রয়েছে। মনে হচ্ছে,এখানে চাবি ব্যবহৃত হয়! চকিতে পদ্মজার মাথায় এলো,আলমগীরের দেয়া চাবিটার কথা। সে দ্রুত পেটিকোটের দুই ভাঁজ থেকে চাবিটি বের করলো। প্রবল উত্তেজনায় তার হাত মৃদু কাঁপছে। বিসমিল্লাহ বলে,চাবি ছিদ্রে প্রবেশ করালো। এবং কাজও করে! পদ্মজা বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে পড়ে! কী হতে চলেছে? সে লোহার এই অংশটি দুই হাতে তোলার চেষ্টা করলো। যতটা ভারী ভেবেছিল,ততটা নয়! পদ্মজা লোহার ভাবলেও,এটা বোধহয় লোহার নয়। ধীরে ধীরে পদ্মজা আবিষ্কার করলো,এটি একটা দরজা,গুপ্ত কোনো ঘরের দরজা। সে আতঙ্কে হিম হয়ে যায়। নিচের দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। পদ্মজা তার কাঁপতে থাকা পা এগিয়ে দেয় ভেতরে। সে ভয় পাচ্ছে না তা নয়! খুব ভয় হচ্ছে। এমন আচানক ঘটনার সম্মুখীন তো আগে হয়নি। সিঁড়ি ভেঙ্গে সে অনেক দূর অবধি নেমে আসে। ভীষণ ঠান্ডা এদিকে। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন! কোনো রূপকথার গল্পের রাক্ষসপুরীতে চলে এসেছে! চোখের সামনে ভেসে উঠে আরেকটি দরজা। এই দরজাটি অদ্ভুত ধরণের। তাদের ঢাকার বাড়িতে হুবুহু একইরকম দরজা আছে! এই দরজার আড়ালে যাই হয়ে যাক বাইরে শব্দ আসে না! পদ্মজা অস্পষ্ট একটা সন্দেহে বিভোর হয়ে উঠে। এই দরজাটি খুলতে আলমগীরের দেয়া চাবিটাই কাজ করে! পদ্মজা চাবিতে চুমু খায়। এতো গুরুত্বপূর্ণ চাবি আলমগীর তাকে দিল কেন? এসব ভাবার সময় এখন নয়। বাকিটুকু তাকে দেখতে হবে। দরজা খুলে অন্য একটি অংশে প্রবেশ করতেই মুখে তীব্র আলো ধাক্কা খেল। পদ্মজা কপাল কুঁচকে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আলোর গতিবেগ রোধ করে মুখে অস্ফুট বিরক্তিসূচক শব্দ করলো। তারপর ধীরে ধীরে পিটপিট করে তাকালো। চারিদিকে রঙ-বেরঙের বাতি জ্বলছে। এই বাতিগুলোও তার চেনা। তাদের বাড়িতে আছে। যখন বিদ্যুত থাকে না,ব্যাটারিচালিত এই বাতিগুলো পুরো বাড়ি আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলে! দুইদিকে আরো দুটো দরজা। প্রথম দরজাটিতে লেখা 'স্বাগতম'।

দ্বিতীয়টিতে লেখা 'ধ-রক্ত।' রুম্পা তো এমন কিছুই বলেছিল! পদ্মজা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দ্বিতীয় দরজাটির দিকে হেঁটে আসে। এটার কোনো তালা নেই। তাহলে খুলবে কী করে? পদ্মজা ধাক্কা দিল। সাথে সাথে খুলেও গেল। পদ্মজার মুখ হা হয়ে যায়। তার ঠোঁট বার বার শুকিয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় এসেছে সে! আর কি ফিরতে পারবে নিজের ঘরে? আচমকা পদ্মজার কানে ভেসে আসে মেয়েদের কান্নার চিৎকার! পদ্মজার রক্ত হিম হয়ে যায়। এরকম একটা জায়গায় এতোগুলো মেয়ে কেন কাঁদছে? কত কষ্ট,যন্ত্রণা সেই কান্নায়! কান্নার বেগ বাড়ছে। যেন কেউ বিরতিহীনভাবে আঘাত করছে। পদ্মজা দুই হাতে ছুরি ও রাম দা শক্ত করে ধরলো। তারপর সেই কান্না অনুসরণ করে এগিয়ে গেলো সামনে। যত এগুচ্ছে কান্নাগুলো তীব্র ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। পদ্মজার নিঃশ্বাস আটকে আছে। সে চলে এসেছে খুব কাছে। চোখের সামনে আরেকটা ঘরের দরজা। দরজাটি একটু খোলা। সে সাবধানে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতর তাকালো। আর ঠিক তখনই তার পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু অবধি শিরশির করে উঠলো। চোখের সামনে দেখা দৃশ্যটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। মনে হচ্ছে জায়গায় জমে গেছে সে। বিবস্ত্র অবস্থায় পাঁচ-ছয়টি মেয়ে হাতজোড় করে কাঁপছে,কাঁদছে। তাদের শরীর রক্তাক্ত। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা শ্যামবর্ণের দেহ। গায়ে শার্ট নেই। প্যান্ট নেমে এসেছে নাভির অনেক নিচ অবধি। তার হাতে বেল্ট! সম্ভবত বেল্ট দিয়েই,মেয়েগুলোকে আঘাত করছিল! প্রশস্ত ও তুষ্টপুষ্ট শরীরের গড়নের মানুষটিকে চিনতে পেরে পদ্মজার বুকের পাঁজর টনটন করে উঠল। তার হাত থেকে পড়ে যায় ছুরি ও রাম দা। বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ অনুসরণ করে উপস্থিতি মানুষগুলোর চোখ পড়ে দরজার দিকে। পদ্মজা ধপ করে বসে পড়ে মাটিতে। শরীরের সবটুকু শক্তি নিমিষেই কে যেন চুষে নিয়েছে! পদ্মজাকে দেখে মানুষটির চোখ হিংস্র জন্তুর মতো জ্বলজ্বল করে উঠে। কপালের শিরা ভেসে উঠে,হিংস্র চাহনি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। সে ভাবতেই পারছে না, পদ্মজা এত দূর চলে এসেছে! পদ্মজা বিস্ময়ভরা ছলছল চোখ দুটি সেই মানুষটার দিকে তাক করে অস্পষ্ট স্বরে বলল,' ছিঃ!'

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৬৩
____
বিছানার উপর কাঁথা মোড়ানো ফরিনার দূর্বল দেহটা শুয়ে আছে। বিদ্যুত নেই। ঘরের এক কোণে লণ্ঠন জ্বলছে। ফরিনার চোখ বোজা। লতিফা পায়ে পায়ে হেঁটে এসে নিঃশব্দে ফরিনার শিয়রে দাঁড়াল। ক্ষীণস্বরে ডাকলো,'খালাম্মা ঘুমাইছেন?'

ফরিনা ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। চোখের দৃষ্টি ঘোলা। কিছু মুহূর্তের ব্যবধানে বয়সের তুলনায় একটু বেশিই যেন বয়স্ক দেখাচ্ছে। ফরিনা কিছু একটা বললেন। লতিফা বুঝলো না। সে নত হয়ে ফরিনার মুখের কাছে নিজের মুখ এনে বললো,'কী কইছেন খালাম্মা?'
ফরিনা দূর্বল গলায় নিম্নস্বরে বললেন,'পদ্মজা কই?'
'আপনের ঘরে না আইলো দেখলাম।'
'ঘুম থাইকা উইঠা তো দেহি নাই।' ফরিনা থামলেন। তারপর বললেন,'এহন কই?'

' মনে কয় ঘরে আছে। ডাইকা দিমু?'
'না, থাকুক।'
'খাইবেন কিছু?'
'না। আরেকটা কেঁথা দে।'

লতিফা আলমারি থেকে লেপ বের করলো। তারপর ফরিনার গায়ের উপর দিল। আর বললো,'অনেক ঠান্ডা পড়ছে খালাম্মা। কাঁথা দিয়া হইবো না।'
ফরিনা লতিফার সাথে আর কথা বাড়ালেন না। তিনি জানালার বাইরে চোখ রাখেন। রাতের আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর শীতল হাওয়া সাঁ,সাঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকছে। তিনি আকাশের গায়ে বাবুর ছোটবেলার মুখটা দেখতে পেলেন। যখন বাবুর জন্ম হলো, আমিনা কপাল কুঁচকে বলেছিলেন,'তোমার ছেড়ায় তো সত্যি কালা হইছে। আমি ঠিকই কইছিলাম।'
আমিনার কথা শুনে ফরিনার বিন্দুমাত্র রাগ হয়নি। বাবুর নিষ্পাপ মুখটা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। সারা মুখে গুচ্ছ গুচ্ছ মায়া। এই মায়াময় শ্যামবর্ণের মুখ দেখে তিনি যেন পিছনের সব কষ্ট ধামাচাপা দিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আদর করে কোলে নিয়ে ডেকেছিলেন,'আমার বাবু।'
মায়াময় এক রত্তি বাবুর নামকরণ হয় আমির হাওলাদার। ধীরে ধীরে বড় হয় আমির। মায়ের চুলের বেণি করে দেয়া ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। মায়ের হাতে তিন বেলা না খেলে পেটই ভরতো না। কতশত আবদার ছিল তার! আম্মা,আম্মা করে বাড়ি মাথায় তুলে রাখতো। যতবার আম্মা ডাকতো ততবার বোধহয় নিঃশ্বাসও নিতো না। ছোট থেকেই আমির স্বাস্থ্যবান,তেজি। বাবা-মায়ের আদরের একমাত্র ছেলে ছিল। যখন আমিরের বয়স চৌদ্দ,তখন সে ফরিনাকে কোলে নিয়ে পুরো বাড়ি ঘুরেছে! ফরিনা সেদিন আবেগে আপ্লুত হয়ে ছেলেকে বকেছেন,উচ্চস্বরে হেসেছেন। জীবনে স্বর্গীয় সুখ নিয়ে এসেছিল আমির। পিছনের কথা ভেবে, ফরিনার ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠলো। চোখ দুটি ভিজে উঠে জলে। এই বয়সে এসে স্মৃতির নরকীয় যন্ত্রণা হজম করা খুব কষ্টের। কম তো বয়স হলো না। পঞ্চাশের ঘরে পড়েছেন। ফরিনার চোখের দেয়াল টপকে উপচে পড়ছে নোনা জল। সেই জল দেখে লতিফা বিচলিত হয়ে উঠলো,'খালাম্মা,ও খালাম্মা। কান্দেন কেন?'
ফরিনা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকালেন। ভেজা কণ্ঠে বললেন,'তুই যা লুতু।'
লতিফা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ পর বললো,'পদ্মরে কিছু কইয়েন না খালাম্মা। কষ্টে মইরা যাইব। ছেড়িডা ভালা আছে। ভালাই থাহক। মা-বাপ নাই।'
ফরিনা লতিফার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,'তুই সব জানতি লুতু?'
লতিফা মাথা নত করে বলল,'হ।'
ফরিনা হিংস্র সিংহীর মতো গর্জে উঠে বললেন,'আমারে আগে কইলি না কেন তুই? আমার বাবু কেমনে আমার হাত থাইকা ছুইটা গেলো? বাপের রক্ত কেমনে পাইলো?'
ফরিনা কাশতে থাকলেন। উত্তেজিত হওয়াতে শরীরের হাড়ে,হাড়ে তীব্র ব্যথা অনুভব হচ্ছে। কেউ যেন কাঁটাচামচ দিয়ে একটার পর একটা ঘা দিচ্ছে। লতিফা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,'খালাম্মা,আপনি চিল্লাইয়েন না। আপনের ক্ষতি হইবো।'
ফরিনা শ্বাসকষ্ট রোগীর মতো ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বললেন,'আমার ক্ষতি হওনের আর কী আছেরে লুতু!'

লতিফা ভয় পেয়ে যায়। ফরিনা বিরতিহীন ভাবে কাশছেন। যেন শ্বাস নিতে পারছেন না। সে দৌড়ে দুই তলায় ছুটে যায় পদ্মজাকে আনতে। ফরিনা ছাদের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে হা করে

কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলেন। মনে হচ্ছে দম গলায় এসে আটকে গেছে। তিনি শূন্য! একেবারে ফাঁকা কোল! মজিদ হাওলাদার নামক নরপিশাচ তার নিষ্পাপ বাবুকে খুন করে,নিষ্পাপ বাবুর মনকে খুন করে বাঁচিয়ে রেখেছে হিংস্র আমিরকে! হাওলাদার বাড়ির রক্ত থেকে তিনি তার বাবুকে পরিষ্কার রাখতে পারেননি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলে আসা পাপের পাহাড় আমির যেন কয়েক বছরে কয়েকগুণ বড় করে তুলেছে! একজন দুঃখী মায়ের শেষ সম্বল হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে ভালোবাসারা,চলছে শুধু অভিনয়! যার কাছেই সেই অভিনয় ধরা পড়বে,তার জায়গা বন্দি ঘরে নয়তো কবরে।

বাতাসটাতে বোধহয় প্রকৃতি বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার বুক জ্বলছে। বুকের ভেতরটা তীব্র দহনে পুড়ে যাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তারই ভালোবাসার স্বামী! আমির হাওলাদার! আমিরের হিংস্র চোখ দুটি শিথিল হয়ে ভয়ে, আতঙ্কে জমে যায়। মস্তিষ্ক মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায়। হুট করে পদ্মজাকে দেখে তার চোখ দুটি স্বভাবসুলভ কারণে জ্বলজ্বল করে উঠে। যা হিংস্র দেখায়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত গতিতে লাফাচ্ছে! হাত থেকে বেল্ট পড়ে যায়। আড়চোখে বিবস্ত্র মেয়েগুলোকে একবার দেখে,তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। এ কোন সময়ে পদ্মজার উপস্থিতি! পদ্মজার গাল বেয়ে জল মেঝেতে পড়ে। আমির দ্রুত পায়ে পদ্মজার কাছে আসে। পদ্মজাকে ছুঁতেই পদ্মজা ছ্যাঁত করে উঠল। ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় আমিরের দিকে। আমির জোর করে পদ্মজাকে তুললো। পদ্মজা জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো। সে দুই হাতে ধাক্কা দেয় আমিরকে। কিন্তু এক চুলও দূরে সরাতে পারেনি। আমির পদ্মজা দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে নিজের এক হাতে চেপে ধরে। অন্য হাতে পদ্মজার মাথা বুকের সাথে চেপে ধরে বললো,'কিছু দেখোনি তুমি।'
তারপর উচ্চস্বরে কাউকে ডাকলো, 'আরভিদ,আরভিদ! দ্রুত মেয়েগুলোকে ঢেকে দাও।'
আমিরের ডাক শুনে সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে একজন দৌড়ে আসে। দেখতে শ্বেতাঙ্গদের মতো। লাল চুল। তার হাতে কাপড়। সে দরজা পেরিয়ে মেয়েগুলোকে ঢেকে দিতে যায়। পদ্মজা কপাল দিয়ে আমিরের বুকে আঘাত করে আর্তনাদ করে বললো,'ছাড়ুন আমাকে। আমার ঘেন্না হচ্ছে আপনাকে। কত নিকৃষ্ট আপনি!'
আমির বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। আচমকা ঘটনায় সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। পদ্মজা ধ্বস্তাধস্তি শুরু করে। তার সারা শরীরে যেন পোকারা কিলবিল করছে। মেয়েগুলোর মধ্য থেকে একজন মেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললো,'আপা আমরারে বাঁচান। এই লোকটা আমারারে মাইরা ফেলব।'
আরভিদ নামের শ্বেতাঙ্গ লোকটি চোখের পলকে মেয়েটির গালে থাপ্পড় বসালো। মেয়েটি আম্মা বলে কেঁদে উঠে। পদ্মজার বুকের হাড়ে,হাড়ে কাঁপন ধরে। এসব কী হচ্ছে! কেন হচ্ছে! সব দুঃস্বপ্ন হয়ে যাক! হয়ে যাক! পদ্মজা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো,'ছাড়ুন আমাকে।'
আরভিদের থেকে পাওয়া কাপড়ের একটু অংশ বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে, একটা মেয়ে পদ্মজাকে দেখছে। পদ্মজাকে দেখে মেয়েটার মনে হচ্ছে এই মানুষটা ভালো। এখানের সবার মতো খারাপ না। তাই সে অনুরোধ করে বললো,'আমাদের বাঁচান আপা। আমাদের অনেক মারে ওরা।'

আমির কিছুতেই পদ্মজাকে হটাতে পারছে না। যেন জায়গায় জমে আছে। মেয়েটির কথা শুনে আমিরের মাথার রক্ত টগবগ করে উঠে। সে তার রক্তচক্ষু দিয়ে ভয় দেখালো। আরভিদ মেয়েটির পেট বরাবর লাথি মারে। মেয়েটি কুঁকিয়ে উঠে কাপড়ের অংশ থেকে দূরে সরে গিয়ে দেয়ালের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেলো। নগ্ন দেহটি দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়েই মেঝেতে পড়ে গুটিয়ে যায়।

সেই গুটিয়ে যাওয়া দেহটির উপরই আরভিদ আরেকটা লাথি বসায়। মেয়েটা চিৎকার অবধি করতে পারলো না! নির্মম,পাশবিক অত্যাচার পদ্মজাকে হিংস্র করে তুললো। সে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আমিরকে দূরে সরিয়ে দিল। আমিরের খেয়াল ছিল মেয়েগুলোর দিকে, তাই সহজেই ছিটকে যায়। পদ্মজা মেঝে থেকে তুলে নিলো ছুরি। আরভিদ কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই পদ্মজা তেড়ে এসে মুখ দিয়ে অদ্ভুত উচ্চারণ করে আরভিদকে আঘাত করলো। আরভিদের পরনে ঘন জ্যাকেট ছিল। তাই তার বেশি আঘাত লাগেনি।তবে সে আকস্মিক আক্রমণে ঘাবড়ে যায়। পদ্মজাকে আঘাত করতে চায়,আমির চেঁচিয়ে উঠলো,'আরভিদ, থামো।'
আরভিদ থামলেও পদ্মজা থামলো না। সে আবার আঘাত করতে উদ্যত হয়, ধরে ফেললো আমির। পদ্মজা হিংস্র বাঘিনীর মতো ফোঁস,ফোঁস করতে থাকে। তার শরীর কাঁপছে ক্রোধে। পদ্মজার রাগ দেখে আমির প্রচণ্ড অবাক হয়। পদ্মজার রাগ সে কোনোদিন দেখেনি! ফ্রান্স থেকে তারা অনেক যন্ত্রপাতি আনে। তার মধ্যে একটি পদ্মজার হাতের ছুরি। যে ছুরির ধার বিষের চেয়েও ধারালো। সে ছুরি পদ্মজার হাতে! আমির জোরদবস্তি করে পদ্মজার হাত থেকে ছুরি ফেলে দিলো। মেয়েগুলো ভয়ে কাঁপছে। তারা এখন পদ্মজাকেও ভয় পাচ্ছে। এতো সুন্দর মেয়ের তেজি রূপ দেখে মনে হচ্ছে, হাজার বছর ধরে যুবতিদের রক্ত দিয়ে গোসল করে সৌন্দর্য রক্ষা করা এক ভয়ংকর সুন্দরী ডাইনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমির পদ্মজাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। পদ্মজা হাত পা ছুটাছুটি করছে। চিৎকার করছে। দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন লোক। তার চুলগুলো মেয়েদের মতোন অনেক লম্বা,তবে ফর্সা। এতো চেঁচামিচি শুনেও ভেতরে যায়নি। কারণ, আমির না বললে তারা এক পাও নড়ে না। আমির পদ্মজার সাথে ধ্বস্তাধস্তি করতে করতে বললো,'মেয়েগুলোকে সামলাও,দ্রুত যাও। আরভিদকে সাহায্য করো।'

লোকটি আমিরের আদেশমতো চলে গেলো। পদ্মজা নিজের কান দুটি বিশ্বাস করতে পারে না। তার স্বামীর কণ্ঠে এ কি শুনছে সে! বুকের জ্বালাপোড়া বেড়ে চলেছে। মরে যেতে ইচ্ছে করছে তার! আমির পদ্মজাকে একটা ঘরে নিয়ে আসে। পদ্মজা নিজের মধ্যে নেই। সে কিড়মিড় করছে,কাঁদছে। আমির পদ্মজাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দ্রুত চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেললো। তখন পদ্মজার সুযোগ ছিলো আমিরকে ধাক্কা মেরে পালানোর চেষ্টা করার। কিন্তু সে পারেনি! সে কার থেকে পালাবে? নিজের স্বামীর থেকে? যাকে সে ভালোবাসে। যে মানুষটা তাকে বুকে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। খাইয়ে দেয়। শতশত আবদার পূরণ করে! পদ্মজা ডুকরে কেঁদে উঠলো। এক হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো,'আমি মেনে নিতে পারছি না।'

আমির পদ্মজার চেয়ে কিছুটা দূরে চেয়ার নিয়ে বসলো। তার চোখেমুখে আতঙ্ক! সে চেয়ে রইলো পদ্মজার দিকে। পদ্মজা চোখ তুলে তাকায়। আমিরের চোখে চোখ পড়ে। সে ঠোঁট দুটি ভেঙে কেঁদে বললো,'আপনি আমাকে বাঁধতে পারলেন?'
আমির কিছু বললো না। পদ্মজা বললো,'আপনি ওভাবে মেয়েগুলোকে মারতেও পারলেন?'
আমির আগের অবস্থানেই রইলো। পদ্মজা নাক টেনে বললো,'এতো খারাপ আপনি? এতো বেশি! মেয়েগুলোকে কেন মারছিলেন?'
আমির শুধু চেয়েই আছে। পদ্মজা বললো,'এতো নিষ্ঠুর আপনি? সব দুঃস্বপ্ন হতে পারে না?'
আমির পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে বললো,'রিদওয়ান কোথায়?'
পদ্মজা কান্না থামিয়ে হাসলো। ধারালো সেই হাসি। ঠোঁটে হাসি রেখেই বললো,'আমাকে পাহারা দিতে রেখেছিলেন? মারতেও কি বলেছিলেন?'
'যা বলছি উত্তর দাও।'

পদ্মজা সেকেন্ড কয়েক আমিরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললো,'মেরে দিয়েছি।'
আমির চমকে উঠলো,'কি!'
'মরেনি। হাসপাতাল আছে।'

আবারও পিনপতন নীরবতা। পদ্মজা আমিরকে দেখছে। যে মুখে মায়া ছাড়া কিছু দেখতো না সে,আজ সে মুখটাই চিনছে না। বুকের ভেতরটা কেমন করছে! আল্লাহ যেন বুকের ভেতর জাহান্নামের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পদ্মজার মস্তিষ্কের সব প্রশ্ন উধাও হয়ে গিয়েছে। শুধু দেখছে আমিরকে, ভাবছে আমিরকে নিয়ে। পদ্মজা ম্লান হেসে জানতে চাইলো,'এখন কী করবেন আমাকে নিয়ে? বুকে ছুরি চালাবেন? নাকি রাম দা? মারার জন্য আর কিছু কি আছে?'
আমির নিশ্চুপ। সে নিজেও জানে না সে কী করবে! পদ্মজা বললো,' পশুরা কাউকে ভালোবাসে?'
আমির মুখ খুললো,'বাসে বোধহয়।'
পদ্মজা হাসলো। হাসতে হাসতে চেয়ারে হেলান দিল। তারপর আবার সোজা হয়ে বসলো। গুরুতর ভঙ্গিতে বললো,'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন।'
'অসম্ভব।'
'আমি ঠিক ছাড়িয়ে নেব।'
'আর কিছু করো না।'
'কী করবেন? খুনই তো।'
'একটু ভয়ডর ঢুকাও মনে।'
'বিশ্বাস করুন,আপনার বুকে ছুরি চালাতে আমার খুব কষ্ট হবে।'

আমির চকিতে তাকালো। পদ্মজা কথাটা বলে কাঁপতে থাকলো। নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! কী বলাচ্ছে! এই কথাটা সে মন থেকে বলেনি। সে কিছুতেই এমন কথা বলেনি! আমির নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,'ভালোই তো ছিলাম আমরা!'
'মুখোশধারীর সাথে আবার ভালো থাকা!'
'একদম মায়ের মতো হয়েছো।'
'নিঁখুত অভিনেতা!'
'বাধ্য হয়ে।'
'কে করেছে বাধ্য আপনাকে?'
'তোমার আদর্শ। তোমার পবিত্রতা।'
'আপনি কলুষিত করেছেন।'
'বিয়ে করেছি।'
'কেন করেছেন? ভোগ করে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন। তাহলে ভালোবেসে আজকের নরকীয় যন্ত্রণাটা সহ্য করতে হতো না।'
'সব ভুলে যাও। রানির হালে থাকবে।' আমিরের কণ্ঠে জোর নেই। সে পদ্মজাকে চিনে। পদ্মজাকে সে এতদিন অন্ধকারে রাখলেও,পদ্মজা তাকে আলোতে রেখেছিল। সেই আলো দিয়ে আমির চিনতে পেরেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা অন্যায় মেনে নেয়ার মেয়ে নয়। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। আজও পদ্মজা জানতে পারতো না কিছু,যদি সে ঝড়ের কবলে না পড়তো! গুটি ওলটপালট হয়ে গেছে! এরেই বোধহয় বলে চোরের দশদিন,গৃহস্থের একদিন।

পদ্মজা ছলছল চোখে আমিরকে দেখে। সে চোখের সামনে সবকিছু দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সর্বাঙ্গে যে কষ্টটা হচ্ছে,শরীর থেকে রুহ বের হয়ে যাওয়ার সময়ও বোধহয় তেমন কষ্ট

হয় না। পদ্মজা ঝরঝর করে কেঁদে দিল। এ কেমন নিয়তি তার! যতক্ষণ সে সামনে থাকে ততক্ষণ প্রেমের কথা বলা মানুষটা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ঠান্ডা মাথায় ভাবছে,তাকে নিয়ে এখন কী করা যায়! পদ্মজা তার হাতের চুড়িগুলো দিকে তাকালো। চুড়ি দুটো তার মায়ের। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে! এই পৃথিবীতে তার একমাত্র ছায়া,একমাত্র ভরসার স্থান ছিল তার মা! মা মারা গেল। তারপর সেই স্থানটা পরিবর্তন হলো আমিরের নামে। সেই মানুষটার রূপ এভাবে গিরগিটির মতো পাল্টে গেল! না,পাল্টে যায়নি। এমনই ছিল। শুধু মুখোশ পরে ছিল। ছদ্মবেশী!

মেয়েগুলোর চিৎকার ভেসে আসে। তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে খুব। কিছু একটা দিয়ে পিটাচ্ছে,ফ্যাচফ্যাচ শব্দ হচ্ছে। কোন বাবা-মায়ের চোখের মণিদের এভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে! পদ্মজা চিৎকারগুলোকে ইঙ্গিত করে বললো,'আপনার কষ্ট হয় না? একটুও হয় না?

আমিরের ভাবান্তর হলো না। সে চিন্তায় মগ্ন। তার ছক উল্টে গেছে। এমন এক জায়গা এসে ছক উল্টেছে যে আর ঠিক করার উপায় নেই। নতুন করে সাজালে সেখান থেকে হয় পদ্মজা নয় এতো বছরের পাপের সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে হবে! তুখোড় আমির মনে মনে পরিকল্পনা করলো, আপাতত,যে কাজের জন্য তার ছুটে আসতে হয়েছে অলন্দপুরে সে কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। এই চাপটা মাথার উপর থেকে গেলে তারপর অন্যকিছু। কয়টা দিন পদ্মজাকে নজরে রাখতে হবে। কিন্তু যদি,সেই কাজ করার পথেই পদ্মজা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়!

পদ্মজা চেয়ার থেকে ছুটতে চাইছে। ছটফট করছে। সে আমিরকে অনুরোধ করলো,'শুনছেন আপনি, ওদের মারতে নিষেধ করুন। আপনার বুক কাঁপছে না? ওদের কান্না অনুভব করুন। ওদের কষ্ট হচ্ছে অনেক। পুরো...পুরো শরীরে রক্ত ছিল। তার উপর আবার মারছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।'

আমির চুপ করে তাকিয়ে আছে পদ্মজার দিকে। তার চোখের পলক পড়ছে না। চাইলেও আর অজুহাত দেয়া সম্ভব নয়। অজুহাত দেয়ার মতো কিছু নেই। এবার যা হবে সরাসরি হবে। পদ্মজার কান্না বেড়ে যায়। পদ্মজা কি মেয়েগুলোর জন্য কাঁদছে নাকি নিজের স্বামীর সমর্থনে মেয়েগুলো অত্যাচারিত হচ্ছে বলে কাঁদছে? কে জানে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com

আমি পদ্মজা - ৬৪

____

সময় নিজের গতিতে ছুটতে,ছুটতে মাঝরাত অবধি চলে এসেছে। সেই তখন থেকে আমির পাথরের মতো বসে আছে। কথাও বলছে না,যাচ্ছেও না। পদ্মজা হাজারটা প্রশ্ন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।
তার গলা শুকিয়ে গেছে। আমির মাঝে শুধু একটা অনুরোধ রেখেছে পদ্মজার। পদ্মজা বলেছিল, সে যে আমিরের কাছে আছে সেটা যেন ফরিনাকে জানানো হয়। তিনি খুব অসুস্থ। চিন্তা করবেন।

আমির পদ্মজার এই অনুরোধ রাখে। তবে ফরিনা এতো অসুস্থ শুনেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। ঘন্টা দুয়েক পূর্বে আচমকা মেয়েগুলোর কান্না,আর্তনাদ বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েগুলোকে কেন এভাবে মারা হচ্ছে তাও আন্দাজ করতে পারছে না পদ্মজা। একবার মনে উঁকি দিয়েছিল, নারী পাচারের কথা। কিন্তু সেই সন্দেহ ধরে রাখতে পারলো না। কারণ, পাচার করার উদ্দেশ্যে থাকলে এভাবে মারতো না। পাশবিক নির্যাতন করতো না। এছাড়া সে এটাও আন্দাজ করতে পারছে না এতো রহস্যের উদ্দেশ্য কী? শুধু এতটুকু বুঝতে পারছে, তার দেখা সব খারাপের গুরু তার স্বামী! পদ্মজা তার ক্লান্ত ঘোলা চোখ দুটি আমিরের দিকে তাক করে দূর্বল কণ্ঠে বললো,'এভাবেই বেঁধে রাখবেন? মেরে ফেলার পরিকল্পনা থাকলে মেরে ফেলুন না।'
পদ্মজা ভেবেছিল আমির বোধহয় উত্তর দিবে না। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে আমির বললো,'তোমার কেন মনে হচ্ছে তোমাকে মেরে ফেলা হবে?'
'কেন? কখনো কাউকে খুন করেননি? অভিজ্ঞতা নেই?' তাচ্ছিল্যের সাথে বললো পদ্মজা।
আমির শান্ত স্বরে বললো,'অন্যরা আর তোমার মধ্যে পার্থক্য আছে।'
পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,'মানে,অন্যদের খুন করেছেন?'
আমির জবাব দিল না। পদ্মজা উত্তেজিত হয়ে পড়লো,'কাকে করেছেন? কয়জনকে করেছেন? আবদুল ভাইকে কি আপনি মেরেছিলেন?'
আমির চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললো,'না।'
'তাহলে কাকে?'
'এতো কথা কেন বলছো?'
'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। কী লাভ ওদের মেরে,আটকে রেখে?'

আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে চলে গেল। পদ্মজার বুকের ভেতর হাহাকার লেগে যায়। বুকের আগুনটাকে চেপে ধরে ভাবে, তাকে স্বাভাবিক হতে হবে। মেয়েগুলোকে নিয়ে কী হচ্ছে,কেন হচ্ছে,কী কাজ চলে এখানে সেটা জানতে হবে। তারপর তার স্বামীর সাথে বোঝাপড়া হবে। কথাগুলো ভেবে পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। তখন একটা হুল্লোড় কানে আসে। অনেকগুলো মেয়ের আকুতি! আবার মারছে! না মারছে না। মেয়েগুলোর কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে তারা বাম দিকে আছে। আর দশ-বারো জন একসাথে আছে! তবে কি এরা অন্য দল? এখানে আরো মেয়ে আছে? পদ্মজা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। আমিরের কণ্ঠ ভেসে আসছে। সে মেয়েগুলোকে খাওয়ার জন্য বলছে। তারপর একজনকে আদেশস্বরে বললো,'রাফেদ,দেখো এরা যেন ঠিক করে খায়। আর সবার বাঁধন একসাথে খুলে দিবে না। একজন একজন করে খুলবে। আর চেঁচামিচি যেন না করে। খাওয়া শেষ হতেই হাত,মুখ বেঁধে ফেলবে। আমি আরভিদকে পাঠাচ্ছি। আরভিদ কোথায়?'
উত্তরে আরেকটি পুরুষ কণ্ঠ কি বললো,পদ্মজা বুঝতে পারলো না। সেই পুরুষ কণ্ঠটি ছাপিয়ে একটি মেয়ের কণ্ঠ ভেসে আসে,'ভাই আমারে ছাইড়া দেন। আমার কয়দিন পর বিয়া। অনেক কষ্টে আমার বাপে আমার বিয়া ঠিক করছে।'

তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ আসেনি! ঘৃণায় পদ্মজার চোখ বুজে আসে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে। তার কিছুক্ষণ পর আমির আসলো। পদ্মজা কান্না থামিয়ে চোখমুখ শক্ত করে অন্যদিকে চেয়ে রইলো। আমির বললো,'খাবার আসছে। খেয়ে নাও।'
'খাবো না।'পদ্মজার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ।
'বিষ দিইনি। লতিফার রান্না। খেতে পারবে।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। আবার চোখ সরিয়ে নিল। লতিফা যে এই বাড়ির রহস্যের সাথে যুক্ত সেটা পদ্মজা আন্দাজ করতে পেরেছিল। এবার বুঝেছে লতিফার কাজ কি! আমির বললো,'কি হলো?'
পদ্মজা বললো,'আমার একটা উত্তর দিন।'
'তোমার তো প্রশ্নের অভাব নেই। '
'এখানে আরো মেয়ে আছে? আপনার কি নারী ব্যবসা আছে?'

শেষ প্রশ্নটা করার সময় পদ্মজার কণ্ঠ কাঁপে। আমির শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললো,'খাবে নাকি সেটা বলো?'
'আপনি আমাকে হারাম টাকায় রানি করেছিলেন?'
'টাকা টাকাই হয়। হারাম,হালাল নেই।'
'মুসলিম তো আপনি,নাকি?'
'আমাদের কোনো ধর্ম নেই।'
'কিসব বলছেন আপনি হ্যাঁ? মাথা ঠিক আছে?' উত্তেজিত হয়ে পড়লো পদ্মজা।
'এরকম ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদার স্বভাব তো তোমার ছিল না।'
'মন আছে আপনার? পৃথিবীর বুকে এমন কোন নারী আছে যে ছয় বছর সংসার করার পর তার স্বামী নারী ব্যবসায়ী,খুনি,অত্যাচারী,নিকৃষ্ট জেনেও কষ্ট পাবে না,কাঁদবে না?'
'এজন্যই তো জানাতে চাইনি। জানতে গেলে কেন?'
'আপনি আপনার নষ্ট জীবনের সাথে আমাকে জড়ালেন কেন?'
'নষ্ট জীবন চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। তোমাকে তো ভালোটাই দেখিয়েছি। তুমি চাদর তুলতে গেলে কেন?'
'এখন সব দোষ আমার তাই না? আপনি খোলস কেন পরলেন? শয়তান শয়তানের মতোই থাকতেন।'
'নিজের জীবনকেও নরক বানালে,সাথে আমারও।'
'মেয়েগুলোকে মেরে কী শান্তি পান? কেন মারেন? এসব করে কী লাভ? ছেড়ে দিন সবকিছু। আমরা একটা ছোট ঘরে সুখে থাকবো। আমাদের ভালোবাসাগুলো তো মিথ্যে না। আমরা তো আমাদের ভালোবাসা নিয়ে ভালো ছিলাম।'
'মন থেকে এটা মানছো?'
'কোনটা?'
'আমাদের ভালোবাসা মিথ্যে ছিল না।'
পদ্মজা কি বলবে ভেবে পায় না! যে মানুষটার মনে অন্যদের জন্য মায়াদয়া নেই। পশুর মতো যার আচরণ সে কী করে কাউকে ভালোবাসতে পারে? এই সমীকরণটা কিছুতেই মানাতে পারছে না সে।
পদ্মজা ভেজাকণ্ঠে বললো,'আপনাকে ক্ষমা করা ঠিক না। আপনাকে কোনো ভালো মানুষ ক্ষমা করবে না। কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালোবাসি। আপনি সবকিছু ছেড়ে দিন। মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। তওবা করুন। আমরা দূরে চলে যাব। সুখে-শান্তিতে থাকবো।'

অনেক আশা নিয়ে উন্মাদের মতো কথাগুলো বললো পদ্মজা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া পদ্মজার মুখে এহেন কথা আশা করেনি আমির। তবুও সে পদ্মজার মনের মতো উত্তর দিতে পারলো না। সে পদ্মজার আশায় বালি ঢেলে দিয়ে বললো,'তুমি সব ভুলে যাও।'

পদ্মজার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এই মানুষটার সর্বস্ব জুড়ে সে নেই। যদি থাকতো,সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে তাকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতো। পদ্মজার বুকের ক্লান্ত সূক্ষ্ম ব্যথাটা আবার বড় আকার ধারণ করে। আমির পদ্মজার বাঁধন খুলে দিলো। পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,'খুলে দিলেন যে?'
'খাবে,চলো।'.
'যদি এখন পালিয়ে যাই?'
'কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে?'
'জানেনই যখন আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। আপনিই আমার শেষ আশ্রয়। তাহলে ফিরে আসুন না আমার কাছে!'
'আবার কাঁদছো।'

পদ্মজা লম্বায় আমিরের কাঁধ অবধি। সে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে আমিরের দিকে। রক্ত জবা ঠোঁট দুটি চোখের জলে ভিজে ছপছপ করছে। আমিরের চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রাণ নেই,নিষ্প্রাণ। শীতল। পদ্মজা আচমকা আমিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আমির দুই পা পিছিয়ে যায়। পদ্মজা জোরে,জোরে কাঁদতে, কাঁদতে বললো,'আপনি এভাবে অচেনা হয়ে যাবেন না। আমি বেঁচে থেকেও মরে যাবো। আমার ভালোবাসাকে এভাবে পর করে দিবেন না। আপনার মনে আছে, একবার আমি রাগ করে দুই দিন কথা বলিনি। তখন আপনি বলেছিলেন, আমাকে এভাবে অচেনা হতে দেখে আপনার কষ্ট হচ্ছে। ভালোবাসার মানুষের অচেনা রূপের মতো ভয়ানক কষ্ট দুটো নেই। এখন আমার সেই ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। আপনি আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন? আমি সব ভুলে যাবো। আপনি ভালো হয়ে যান। মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন। ধ্বংস করে দিন আপনার সব পাপের চিহ্ন।'

আমির এক হাত রাখে পদ্মজার মাথার উপর। পদ্মজা অশ্রুভরা চোখে তাকায়। আমির পদ্মজার চোখের জল মুছে দিয়ে বললো,'গালে ব্যথা পেয়েছো কী করে?'
'এতক্ষণে দেখেছেন?'
'না।'
'সেদিন জঙ্গলে এসেছিলাম। কাঁটা লেগেছিল। তারপর...'
'রিদওয়ান মেরেছিল?'
'হু।'
'কেন আসতে গেলে? সাধারণ দুনিয়ার বাইরেও মানুষের বানানো আরেক জগত থাকে। সেই জগতে পবিত্র মানুষদের ঢুকতে নেই।'
'ভেঙে ফেলুন সব।'
'নিজের হাতে যত্ন করে করা সাম্রাজ্য ভাঙা যায় না।'
'পাপের সাম্রাজ্য ধরে রেখে কেন পাপ বাড়াবেন? আমাদের ভালোবাসাকে কেন বলি দিবেন?'
'আমার রক্ত ভালো না। কেউ আমাকে পশু বললে,আমার আনন্দ হয়।'
'তাহলে আপনি ছাড়বেন না কিছু?'
'না।'
পদ্মজা নিরাশ হয়ে বসে পড়ে চেয়ারে। আমির বললো,'খাবে নাকি খাবে না?'
'আমি এখানে খেতে আসিনি!'
'তাহলে না খেয়েই থাকো।'

পদ্মজা চুপ থাকে। নিজের মস্তিষ্ককে শান্ত করার চেষ্টা করে। খেয়েদেয়ে সুস্থ থাকতে হবে। মেয়েগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। এখন নিজেকে এভাবে ভেঙে যেতে দেওয়া যাবে না। সে লম্বা করে বার কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল। তারপর বললো,'খাবো।'

আমির বের হয়ে যায় সেদিন রাতে আর ফিরে আসেনি। মেয়েদের মতো সিল্কি লম্বা চুলের লোকটি খাবার নিয়ে আসে। তার নাম রাফেদ। পদ্মজা যতক্ষণ খায়,দাঁড়িয়ে থাকে। পদ্মজার খাওয়া শেষ হতেই রাফেদ পদ্মজাকে বাঁধতে চাইলো,তখন পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'উনি কোথায়? আপনি কেন বাঁধছেন?'
'বাইরে গিয়েছেন। আমাকে বলেছেন,আপনার খাওয়া শেষ হলে বেঁধে রাখতে।'
'কী করতে গিয়েছে?'
'এতসব বলতে পারব না। স্যার অনেক রাগী। স্যারকে রাগাবেন না। যা বলবে মেনে নিবেন।'
'আপনার স্যার তো আমাকে ভয় পায়। আমার কথায় সারাক্ষণ এই ঘরে ছিল। ভয়ে কেঁপেছেনও। বিশ্বাস করুন।'
রাফেদ হাসলো। এই হাসিকেই বোধহয় বলে শয়তানের মতো হাসা।
'মজা করছেন?'
'আচ্ছা, ওই সাদা খরগোশটা কোথায়?'
'খরগোশ?'
'ওইযে,সাদা দেখতে। আরদিদ বা এরকম কোনো নাম।'
'তা জেনে আপনি কী করবেন? ' রাফেদ এগিয়ে আসে বাঁধার জন্য। পদ্মজা আড়চোখে কিছু একটা খুঁজে। কিন্তু রাফেদকে আক্রমণ করার মতো কিছু পেল না। ঘরে কিছু বলতে দুটো চেয়ারই আছে। চেয়ার গুলো কি খুব ভারী? একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। পদ্মজা দুই পা পিছিয়ে যেয়ে বললো,'আপনাদের বাড়িটা অনেক সুন্দর। পাতালে বাড়ি আমি কখনো দেখিনি। একটু ঘুরে দেখি? আমার উনি বানিয়েছেন তাই না?'
'এটা স্যারের বানানো না।'
'তাহলে কার?'
রাফেদ পদ্মজার ন্যাকামি বুঝে যায়। সে তেড়ে আসে। পর পুরুষের সাথে ধস্তাধস্তিতে পদ্মজার মন সায় দিচ্ছে না। এখান থেকে পালালেও বাইরে আরেক শয়তান আছে। পালিয়েও লাভ নেই। তার চেয়ে এখানে থেকেই পরিস্থিতি বোঝা উচিত। পদ্মজা দ্রুত চেয়ারে বসে পড়ে বললো,'ধস্তাধস্তি করবেন না। আমি বসে পড়েছি। আপনি বাঁধুন।'

রাফেদ পদ্মজাকে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে চলে যায়। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে! মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করে মাটির কতোটা নিচে আছে সে। বেশ অনেকক্ষণ পার হওয়ার পর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। পদ্মজা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমির প্রবেশ করে। তার হাতে মলম জাতীয় কিছু। পদ্মজা কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকে। আমির পদ্মজার দিকে মলম এগিয়ে দিয়ে বললো,'ঔষধপত্র নিয়ে আসা উচিত ছিল।'
'আমি কি জানতাম নাকি, এখানে আমার বর শয়তানের রাজত্ব নিয়ে বসে আছে?'
'খুব কথা বলছো।'
'মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিন।'
'এক কথা বার বার বলো না।'
'আমাকে ভালোবাসেন না?''

Kobitor.com

পদ্মজা তার মায়াময় দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করে আমিরের চোখে প্রাণ এসেছে! সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার মনের জানালার পাল্লা খুলে গিয়ে মুঠো,মুঠো বাতাস প্রবেশ করে। অশান্তিতে অবশ হয়ে যাওয়া মন,মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠে। আমির পদ্মজার প্রশ্নের জবাবে কিছু বললো না। হাতের বস্তুটি পদ্মজার পায়ের কাছে রাখলো। তারপর পদ্মজার বাঁধন খুলে দিয়ে বললো,'গালে,পায়ে লাগিয়ে নিও। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করো না।'

বলেই সে বেরিয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়। পদ্মজার চাঙ্গা হয়ে যাওয়া মনে আবার মেঘ জমে। সে মেঝেতে 'দ' ভঙ্গিতে বসে পড়ে।

বর্তমান।
পদ্মজার কান্না যেন থেমে থেমে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তুষার কথা বলতে গেল, কিন্তু ফুটল না। পদ্মজার বিষাদভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলো। পদ্মজা দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলো। মেয়েটার কান্না রোগ বোধহয় সেদিন থেকেই হয়! যেদিন জানলো তার স্বামীর আসল পরিচয়। তুষার থামতে বললো না। পদ্মজাকে কাঁদতে দিল। অনেকক্ষণ কাঁদার পর পদ্মজা পানি খেতে চাইলো। তাকে পানি দেওয়া হলো। তারপর চুপ হয়ে যায়। নেমে আসে পিনপতন নিরবতা। যতক্ষণ না তুষার আর প্রশ্ন করবে পদ্মজা কিছু বলবে না। তাই তুষার নিরবতা ভেঙে বললো,'তার অন্যায় জেনেও তাকে মাফ করতে চেয়েছিলেন। রাতের এইটুকু শুনে তো মনে হচ্ছে না, আপনি আমির হাওলাদারকে কখনো খুন করতে পারেন। পাগলের মতো ভালোবেসেও তার বুকে ছুরি চালানোর সাহস হলো কী করে?'
পদ্মজা তুষারের উৎসুক মুখটার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। ফিসফিসিয়ে বললো,'মুক্তি দিয়েছি,মুক্তি!'
'আপনার বর্ণনা অনুযায়ী আপনার প্রতি আমির হাওলাদারের ব্যবহার নরম ছিল। তিনি আপনার প্রতি দূর্বল ছিলেন।'
পদ্মজা উদাসীন হয়ে কিছু একটা ভাবলো। তারপর বললো,'দূর্বল ছিল নাকি!'
'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'
'আমি উনাকে খুব ভালোবাসি স্যার।' পদ্মজার কণ্ঠটা কেমন শোনায়! সে তার স্বামীকে খুন করে এসে জেলে বসে তার জন্যই কাঁদছে। কি অবাক কাণ্ড! তুষার বললো,'আপনার ভাষ্যমতে তিনি একজন শয়তান ছিলেন। শয়তানকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজেকে পাপী মনে হয়নি?'
'হয়েছে।'
'তাহলে সেটা কী করে ভালোবাসা হলো?'
পদ্মজা কাঁদতে থাকলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো,'যখন কাউকে ভালোবাসবেন তখন বুঝবেন। ভালবাসায় দোষ-গুণের স্থান নেই। ভালবাসা শুধুই ভালবাসা। ভালোবাসা গুণী-খুনী,পাপ-পুণ্যের ভেদাভেদ করে না।'

তুষারের মনে হচ্ছে তার বুকে যেন একটা বড়সড় পাথর। আমিরের প্রতি পদ্মজার ভালোবাসার তীব্রতা তাকে কাতর করে তুলেছে। বার বার মনে হচ্ছে, সেই মানুষটাও বোধহয় পদ্মজাকে ভালোবাসতো। কিন্তু পাপ তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সে কি কখনো পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিল? প্রশ্নটা তুষারের মনে আসতেই তার উত্তেজনা বেড়ে যায়। পদ্মজাকে প্রশ্ন করে,'তিনি কি পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন? তারপর আর ভালোবেসেছিলেন আপনাকে?'
তুষারের প্রশ্নে পদ্মজা থম মেরে গেল। শূন্যে দৃষ্টি রেখে আওড়াল,'চেষ্টা কি করেছিলেন? করেছিলেন কি?'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৬৫

তুষার হাঁসফাঁস করা অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। পদ্মজা তখনও শূন্যে দৃষ্টি রেখে বিড়বিড় করছে। মেয়েটা যেদিকে তাকায় সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। তুষার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ডাকলো,'মিস পদ্মজা?'
পদ্মজা তাকাল। তার চোখ দুটি ফোলা। আর ঠোঁট দুটি সবসময় তিরতির করে কাঁপে। তুষারের তীক্ষ্ণ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে পদ্মজা বললো,'আমার ফাঁসি কবে হবে? এত দেরি হচ্ছে কেন?'
পদ্মজার কণ্ঠে ফাঁসির জন্য আকুতি! একটা মানুষ কতোটা নিঃস্ব হলে পৃথিবী থেকে মুক্তি চায়? তুষারের ধারণা নেই। সে তার ভেতরের মায়া লুকিয়ে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো,'আপনাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর দিলেন না তো?'
পদ্মজা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'কোন প্রশ্ন?'
মুহূর্তে ভুলে গিয়েছে! তুষার অবশ্য এতে রাগলো না। সে আবার প্রশ্ন করলো,'তিনি কি পাপ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করেছিলেন? তারপর আর ভালোবেসেছিলেন আপনাকে?'
'আগে বলুন,পিশাচের মতো যাদের আচরণ তারা কাউকে ভালোবাসতে পারে?'
তুষার তার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবলো। ভেবে বললো,'পারে। তারা কম মানুষকে ভালোবাসে। কিন্তু যাকে ভালোবাসে তার সাথে সব ভালো করে। আর যার সাথে খারাপ তার সাথে খারাপই। তবে এদের পিশাচসিদ্ধে বাঁধা পড়লে তখন ভালোবাসা থাকে কি না আমার জানা নেই।'
পদ্মজা উদাস হয়ে বললো, 'আমি সব জেনে যাওয়ার পর,কখনো মনে হতো তিনি ব্যাকুল আমার জন্য। আর কখনো মনে হতো আমার সামনে স্বয়ং শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। এই ভালো,এই খারাপ! উনি উন্মাদের মতো হয়ে যেতেন। কি করছেন না করছেন তা যেন নিজেও বুঝতেন না।'
'আই থিংক, তিনি দুটো জীবন নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। তারপর সময় চলে আসে একটা বেছে নেয়ার তখন তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।'
পদ্মজা চকিতে তাকাল। অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলো,'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত!'

অতীত।
শিশির ভেজা ঘাসে পা দিতেই সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা পূর্ণার বেশ ভালো লাগছে। সে ভোরের নামায পড়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে এসেছে তার বোনের খবর যেন পাওয়া যায়। এখন সে উত্তরের হাওড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে মৃদুলের জন্য। ভোরের দমকা বাতাস ও কুয়াশায় তীব্র শীতে সে কাঁপছে। তবুও ভালো লাগছে। পূর্ণার শীতে কাঁপতে খুব ভালো লাগে! কি আশ্চর্য ভালো লাগা! মৃদুল কুয়াশা ভেদ করে পূর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণার পরনে বেগুনি রঙের সোয়েটার। তার কাঁপুনি চোখে পড়ার মতো। মৃদুল তার গায়ের শাল দিয়ে পূর্ণার মাথা ঢেকে দিল। বললো,'এই ঠান্ডার মধ্যে টুপি ছাড়া ঘর থাইকা বাইর হইছো কেন? আর জুতা খুলছো কেন? পরো।'
'পরো' শব্দটি ধমকে উচ্চারণ করলো। পূর্ণা দ্রুত জুতা পরে নিল। বললো,'শাল দিয়ে দিলেন যে,আপনার ঠান্ডা লাগবে না?'

'আমারে দেইখা লাগে আমার ঠান্ডা লাগতাছে? গেঞ্জি পরছি,তার উপর শার্ট, তার উপর সোয়েটার। এইযে গলায় মাফলার, মাথায় টুপি। হাত,পায়েও মোজা আছে। এরপরেও আমার ঠান্ডা লাগবো?'
পূর্ণা হেসে বললো,'না।'
তারপর পরই বললো,'আজ দুপুরে না আবার যাবেন বলছিলেন।'
'হু,যাব তো। লিখন ভাইরে নিয়া যাবো। পদ্মজা ভাবি আমির ভাইয়ের সাথে যখন আছে ভালোই আছে। তবুও খোঁজ নিমু আমি। এতো চিন্তা কইরো না।'
পূর্ণা অন্যমনস্ক হয়ে বললো,'আচ্ছা।'
'খাইয়া আইছো?'
মৃদুলের ফর্সা গাল,সহজ-সরল দুটি চোখ,জোড়া-ভ্রু আর গোলাপি ঠোঁটগুলো এক নজর দেখে পূর্ণা বললো,'হুম। আপনি খেয়েছেন?'
'আর খাওয়া।'
'কেন? খাননি?'
'জাকিররে চিনো না? জাকিরের বাড়িত উঠছি। ওর আম্মা গেছে বাপের বাড়ি। ওর আব্বা আর আমি একসাথে আছিলাম। রাঁধবো কে?'
'জাকিরের দাদি কোথায়?'
'বুড়ির অসুখ। আইচ্ছা বাদ দেও।'
'বাদ দেব কেন? ফুপা কয়টা কথা বলেছে বলে এভাবে বাড়ি ছেড়ে দিবেন? নিজেরই তো ফুপা।'
' আত্মসম্মান বলে তো একটা কথা আছে। পদ্মজা ভাবির খোঁজটা তোমারে দেওনের লাইগগাই আছি। নইলে রাইতেই যাইতামগা। আমার এতো বড় বাড়ি রাইখা আমি এইহানে কথা শুনে পইড়া থাকুম কেন?'
পূর্ণা রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে জানতে চাইলো,'তাহলে আজ চলে যাবেন?'
মৃদুল পূর্ণার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আড়চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। পূর্ণা চোখ বড় বড় করে উত্তরের আশায় তাকিয়ে আছে। মৃদুল মুচকি হাসলো। মৃদুলের হাসি দেখে পূর্ণা উশখুশ করে বললো,'হাসার কি বললাম?'
'তুমিও চলো।'
'কোথায়?'
'আমার বাড়িতে।'
'ধুর! এ হয় নাকি!'
মৃদুল কপালে ভাঁজ সৃষ্টি করে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো,'সব পুরুষরা তো বিয়ে করে বউ নিয়ে নিজের বাড়িতেই যায়। তাহলে আমার বেলা এ হয় না ক্যান?'
মৃদুলের কথায় পূর্ণা বাকরুদ্ধ! মৃদুল তাকে বিয়ের কথা বলেছে! পূর্ণার শ্যামবর্ণের মায়াবী মুখটায় লজ্জারা জমে বসে। ঠোঁটে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠে। সে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করলো। মৃদুল বললো,'চলে যাইতাছো ক্যান?'
'আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।'
'আরে যাইয়ো না।'
'যাচ্ছি।'
'কথা হুনো।'
পূর্ণা থামে না। তাই মৃদুল দৌড়ে আসে পূর্ণার পাশে। হাঁপাতে, হাঁপাতে বললো,'এতো শরম পাও ক্যান?'

পূর্ণা লজ্জাশরম আর নিতে পারছে না। মৃদুলের কথায় সে লজ্জায় ঝিমিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রসঙ্গ পাল্টাতে বললো,'আমাদের বাড়িতে চলুন। খেয়ে যাবেন।'
'উম,খাওন যায়। বাসন্তী খালার রান্না কিন্তু এক্কেরে খাঁটি।'
'আপনি তো বড় আম্মার সব রান্না খেয়ে দেখেননি। খেলে বুঝতেন কত মজা!'
'তাহলে তো এই বাড়িতে জামাই হতেই হবে।'

পূর্ণা হেসে দিল। বেশি লজ্জা পেলে মানুষ হাসি আটকে রাখতে পারে না। পূর্ণার বেলাও তাই হলো। তারা দুজন গল্প করতে করতে মোড়ল বাড়িতে আসে। পথেঘাটে অনেকের সাথে দেখা হয়। সবাই জহুরি চোখে তাদের দেখে। তাতে অবশ্য মৃদুল-পূর্ণার যায় আসে না। দুজন একই রকম।তারা সমাজকে উপেক্ষা করে নিজেদের আনন্দ নিজেরা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করতে চাইলেও কি উপেক্ষা করা যায়? এই সমাজ নিয়েই বাঁচতে হয়।

দুপুরে মৃদুল লিখনের খোঁজে গেওয়া পাড়ার বড় ধানক্ষেতে আসলো। ধানক্ষেতের মাঝে শুটিং চলছে। একটা সুন্দর গ্রাম্য গানের তালে,লিখন নাচছে। মাথায় গামছা বাঁধা। পরনে লুঙ্গি,শার্ট। সব বেশভূষাতেই তাকে সুন্দর লাগে। আকর্ষণীয়! দূরের পথের বট গাছের আড়ালে কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাদের স্বপ্নের পুরুষকে দেখছে। যার সামনে দাঁড়ানোর সাহস এবং ক্ষমতা কোনোটাই তাদের নেই। লিখনের সাক্ষাৎ তাদের ঘুম কেড়ে নেয়। মৃদুল দাঁড়িয়ে থেকে শুটিং দেখে। লিখনের খেয়ালে মৃদুল পড়তেই সে হাত নাড়ায়। মৃদুলও হাত নাড়ালো। শুটিং শেষ হতেই লিখন আসে। মাথা থেকে গামছা সরাতেই ঝাঁকড়া চুলগুলো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠে। সে মৃদুলের সাথে করমর্দন করে বললো,'দুঃখিত, তোমাকে অপেক্ষা করতে হলো।'
'আমার ভালোই লাগতেছিল।'
একজন দুটো চেয়ার নিয়ে আসে। লিখন বললো,'বসো।'
দুজন বসলো। মৃদুল বললো,'ও বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি যাবা তো?'
'হু যাবো। তবে,আমি বাড়ির চেয়ে দূরে থাকবো। বাড়ির ভেতর বা কাছে যাব না। এটা ভালো দেখাবে না।'
'খারাপ দেখাইবো কেন?'
'আর বলো না, একজন মজার ছলে আজ আমাকে বলেছে, আমাকে হাওলাদার বাড়িতে দেখা যায় সবসময়। কার জন্য যাই? পদ্মজার জন্য নাকি? আমাদের আগে কোনো সম্পর্ক ছিল নাকি। এমন অদ্ভুত কথা। কিন্তু গিয়েছি মাত্র দুই দিন। একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে এভাবে ছড়িয়ে গেলে পদ্মজার জন্য খুব খারাপ হবে। সম্মানহানি হবে।'
'মানুষ মিথ্যা কইলেই হইবো?'
'তোমাকে আমি আগেও বলেছি,পদ্মজা একবার অসম্মানিত হয়েছে। এজন্য আমার খুব ভয় করে। আমার এই একটাই ভয়। মিথ্যে হউক অথবা সত্য,পদ্মজা দুর্নামি হউক সেটা চাই না।'
'তাইলে যাওনের কি দরকার?'
লিখন হাসলো। হেসে বললো,'রাগ করো না মৃদুল। ছয় বছর আগ থেকেই আমার নামের সাথে পদ্মজার নাম জড়িয়ে একটু কানাঘুষা আছে। এখন যদি বার বার ওই বাড়িতে যাই মানুষ অনেক কথা বানাবে।'
'বুঝছি ভাই। রাগ করি নাই।'
'তাহলে চলো। আমি কাপড় পাল্টে নিই। তারপর যাবো।'

দুজন চলে আসে হাওলাদার বাড়িতে। লিখন হাওলাদার বাড়ির চেয়ে দূরে একটা মাঠে অপেক্ষা করে। দারোয়ান মৃদুলকে ঢুকতে দিল। মৃদুল দারোয়ানের পেটে থাপ্পড় দিয়ে বললো,'শালার পেটলা! এখন ঢুকতে দিলি ক্যান?'
'বড় চাচায় কইছে।'
মৃদুল আলগ ঘরের বারান্দায় দেখলো মজিদকে। সে দারোয়ানের মাথায় একটা টোকা দিয়ে আলগ ঘরে চলে আসে। মজিদ হাওলাদার চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। এই মানুষটা মৃদুলের খুব পছন্দের। এমন সৎ,উদার মানুষ সে দুটো দেখেনি। দেখলেই ভক্তি চলে আসে। অলন্দপুরের মানুষ সুখী এই মানুষটার জন্যেই। সবসময় বাইরে থাকেন। হুটহাট বাড়িতে পাওয়া যায়। মৃদুল মজিদের সামনে এসে দাঁড়াল।সালাম দিল,'আসসালামু আলাইকুম মামা।'
মজিদ হাওলাদার বই থেকে চোখ তুলে উত্তর দিলেন,'ওয়ালাইকুম আসসালাম। মৃদুল নাকি?'
'জি,মামা।'
'তুমি বাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছো? রাতে দেখলাম না।'
মৃদুল মাথা নত করে বললো,'আলম ভাইয়ের বাড়িতে। জাকিরের আব্বা।'
'তুমি আমার বাড়ি রেখে অন্যের বাড়িতে গিয়ে থাকছো,এটা ঠিক না মৃদুল। আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি।'
'কেউ অপমান করলে কি আর থাকা যায়?'
'শুনছি আমি, এটা খলিলের বাড়ি নাকি আমার বাড়ি? তুমি এখানেই থাকবে।'
'আইজ চইলা যামু বাড়িত।'
'এ তো তোমার রাগের কথা। রাগের সিদ্ধান্ত। আর কয়টা দিন থেকে যাও। ফুপার কথা রাখো। তোমার আব্বা শুনলে কি বলবেন?'
'আব্বারে কইতাম না।'
'যা বলছি শুনো।'
'আচ্ছা,মামা।'
'যাও ঘরে যাও। দুপুরের খেয়েছো? না খেলে খেয়ে নাও।'
'যাইতাছি। আচ্ছা,মামা আমির ভাই কই?'
'আমিরতো ঢাকা গেছে।'
'কয়দিন ধরে?'
'গতকাল বিকেলেই গেল।'
'পদ্মজা ভাবিরে নিয়ে গেছে?'
'হুম। দুজনই গিয়েছে। চলে আসবে দুই-তিনদিনের মধ্যে।'
'আচ্ছা মামা,গত কয়দিন আমির ভাই কই আছিল?'
'ঢাকা ছিল। তারপর এসে পদ্মজাকেও নিয়ে গেছে। পদ্মজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার বোধহয়। এত কি আর আমাদের বলে? তুমি এতো ভেবো না। যাও খেতে যাও।'

মৃদুল মজিদের কথা বিশ্বাস করে নিল। অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। মৃদুল ভাবলো। তাহলে দাঁড়াল যে, 'আমির ভাই এতদিন ঢাকা ছিল তাই পদ্মজা ভাবিকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। এজন্য কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। আমির ভাই পদ্মজা ভাবির জন্য কেমন পাগল সবাই জানে! তাই এই পাগলামি মানা যায়। তারপর কোনো জরুরী কাজে পদ্মজা ভাবিকেও নিয়ে যাওয়া হয়। মজিদ মামার কথামতো সেই জরুরি কাজ পদ্মজা ভাবির বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপার হতে পারে। পরীক্ষা বা অন্য কিছু।'
মৃদুল মনে মনে খুশি হয়। সে মজিদকে বললো,'মামা আমি আইতাছি।'

Kobitor.com

তারপর বেরিয়ে আসলো। লিখনকে সব বললো। তার ভাবনাও জানালো। লিখনও মেনে নিল। মৃদুল চলে যেতেই মজিদ হাওলাদার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিনার কাছ থেকে তিনি শুনেছেন,মৃদুল,লিখন এসেছিল। আর কী কথা হয়েছিল তাও জেনেছেন। তাই গুছিয়ে ব্যাপারটাকে সামলাতে পেরেছেন।

____

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে পদ্মজা। তাকে স্বাগতম দরজা দিয়ে এওয়ান(A1) নামে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। দুপুর অবধি সে ঘরে বন্দি ছিল। হাত-পা বাঁধা ছিল না। তারপর যখন কতগুলো মেয়ের বুকফাটা আর্তনাদ তাকে কাঁপিয়ে তুলে, বাতাস ভারি হয়ে ওঠে তখন দরজায় জোরে,জোরে শব্দ করেছে। ফলস্বরুপ তার হাত-পা বেঁধে তাকে অন্য দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। রাফেদ নিয়ে এসেছে। গত রাতের পর আমিরের সাক্ষাৎ আর মিলেনি। মানুষটা এখানেই আছে,সে কণ্ঠ শুনেছিল। শুধু তার কাছে আসেনি।

আমির পাতালঘরের দরজার সামনে বসে আছে। এক পাশে ধ-রক্ত লেখা দরজা,অন্য পাশে স্বাগতম দরজা। ধ-রক্তের ভেতর চারটি ঘর। স্বাগতমের ভেতর পাঁচটি ঘর। এ নিয়েই পাতালঘর। সে হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে কিছু চিন্তা করছে। কপালের রগগুলো দপদপ করছে। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ হলো। রিদওয়ান,খলিলের এখানে আসার কথা ছিল। সকালে মজিদ ও খলিলের সাথে তার কথা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আহত হলে হাসপাতালে রাখা হয় না। নিজেদের দেখাশোনা নিজেদের করতে হয়। রিদওয়ানের জ্ঞান ফিরেছে। তবে অবস্থা ভালো নয়। এতে আমিরের যায় আসে না। বেঁচে আছে তো তাকে হাসপাতালে আর থাকতে দিবে না। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য্য হয়ে আমির উঠে পড়ে। তখন ফট করে পাতাল দরজা খুলে যায়। প্রবেশ করে মজিদ,খলিল আর রিদওয়ান। রিদওয়ানের মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। মাথায় ব্যান্ডেজ। চোখ নিভু,নিভু। খলিলের হাতে বিভিন্ন ঔষধপত্র, স্যালাইন। মজিদ প্রবেশ করেই বললেন,'তোর বউ কোথায়?'
আমির উত্তর দিল না। সে পদ্মজার ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী নয়। খলিল বললেন,'এই ছেড়ির কইলজাডা বেশি বড়। এইহানে আইয়া পড়ছে। আমি কইতাছি ভাই, এই ছেড়িরে সময় থাকতে সরায়া না দিলে এই ছেড়ি একদিন আমরারে সরায়া দিব। বাবলুর মতো জাত খুনিরে মাইরা ফেলছে। আর আমরারে পারব না?'
আমির কারো সাথে কোনোরকম কথা না বলে,'রিদওয়ানের শার্টের কলার চেপে ধরলো। কিড়মিড় করে চাপাস্বরে বললো,'পদ্মজার গলায় দাগ হলো কী করে? '
রিদওয়ানের অবস্থা শোচনীয়। তাকে আরো কয়টা ঘন্টা সময় দিলে সে কিছুটা শক্ত হয়ে যেত। আমির এভাবে চেপে ধরাতে তার জান বেরিয়ে আসতে চাইছে। মজিদ আমিরকে টেনে সরিয়ে আনে। বলে,'মারিস না,মরে যাবে।'
আমির তার ভয়ংকর চোখ দুটি রিদওয়ানের মুখের উপর রেখে বললো,'কুত্তার বাচ্চারে আমি জবাই দেব।'
'আমির আব্বা, এখন বউয়ের প্রতি মায়া দেখানোর সময় না। মাত্র আট দিন বাকি। রিদওয়ানকে সুস্থ হতে হবে। আমাদের সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। একুশজন মেয়ে আটদিনের মধ্যে যোগাড় করতে হবে।'
মজিদের কথা আমিরের উপর কাজ করে। সে খলিলকে বলে, এটু(A2) ঘরে রিদওয়ানকে রাখতে। খলিল রিদওয়ানকে নিয়ে যান। মজিদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিরকে দেখে বললেন,'আমরা কিন্তু এখন বিপদের উপরে আছি। কিছুতেই মন অন্য জায়গায় দেয়া যাবে না। বিপদ থেকে রক্ষা

না পেলে এতদিনের কষ্টে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য জলে যাবে। তোর হাতে সব দিয়েছি। কারণ, আমি জানি আমার ছেলে বাঘের বাচ্চা। সে সব কিছু পারে। থাবা দিয়ে সব ধ্বংস করে দিতে পারে। অর্থের উপরে কিছু নেই। অর্থ দিয়ে সব কেনা যায়।'

মজিদের কথাগুলো আমিরের উপর বিষাক্ত বিষের মতো প্রভাব ফেলে। মুহূর্তে মধ্যেই তার পূর্বের ধ্যান-জ্ঞান মস্তিষ্ক জুড়ে বসে। পদ্মজার সাথে দেখা হওয়ার পর সে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন তো হওয়া যাবে না। কিছুতেই না। নারীর আকুতি-মিনতি আর অর্থের চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আমির অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকাল। তারপর মজিদকে নিয়ে ধ-রক্তে প্রবেশ করলো। ধ-রক্তের বিওয়ান(B1) ঘরে প্রবেশ করতেই মজিদের মনটা ভরে যায়। নগ্ন কতগুলো দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এক-দুটো নড়ছে। গোঙাচ্ছে! যা তাদের জন্য চক্ষু শীতল দৃশ্য। আরভিদ এসে জানালো,' দুটো মেয়ে মারা গেছে।'
আমির ভ্রুকুটি করে জানতে চাইলো,'কোন দুটি মেয়ে?'
আরভিদ লাঠি দিয়ে ঠেলে দুটি নিস্তেজ দেহ দেখালো। আমির বললো,' দুটোকে আলাদা করো। আর একটা বস্তা আর ছুরি,রাম দা নিয়ে আসো। চাচারে বলবা আসতে।'
আরভিদ চলে গেল। মজিদ বললেন,'আজ ট্রলার লাগবে?'
'লাগবে। লাশ রেখে দিলে দূর্গন্ধ ছড়াবে। আর মন্তুরে বলে দিও, বড় নদীতে ফেলতে। মাদিনীতে যেন না ফেলে। শফিক বলছে, কয়দিন পর পর একই নদীতে লাশ পায় যা সন্দেহবাতিক। ওদের থানায় তদন্ত চলছে।'
মজিদ মহা বিরক্তি নিয়ে বললেন,'মন্তুরে মনে চায় জুতা দিয়ে পিটাই। বার বার বলার পরও একই ভুল করে।'
'কয়টা ঘা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাফেদ পদ্মজার জন্য খাবার নিয়ে আসে। প্লেট বিছানার এক পাশে রেখে পদ্মজার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই রাফেদ কিছু বুঝে উঠার পূর্বে রাফেদকে জোরে ধাক্কা মারলো পদ্মজা। রাফেদ এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুশো বছরের পুরনো পাতালঘরের দেয়ালে বারি খেতেই মাথা চক্কর দিয়ে উঠে। ততক্ষণে পদ্মজা বেরিয়ে যায়। পদ্মজা নিশ্চিত হয়ে গেছে,তাকে কেউ আক্রমণ করবে না। আমির আক্রমণ করতে নিষেধ করেছে। তাই সে নির্ভয়ে রাফেদকে আঘাত করে বেরিয়ে আসে। এক ছুটে প্রবেশ করে ধ-রক্তে। আমিরের সাথে তার কথা আছে। সে কি চায়? জানতে চায়। এভাবে সময়টাকে থামিয়ে রাখলে চলবে না। বিওয়ান(B1) ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পদ্মজা। গতকাল দেখেনি দরজার বিওয়ান লেখাটি। আজ দেখেছে। তার বুক কাঁপছে দুরুদুরু! মজিদ হাওলাদারের হাসি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে গোঙানির শব্দ। পদ্মজার লোমকূপ দাঁড়িয়ে পড়ে। সে দরজা ঠেলে উঁকি দেয়। গতকাল দৃশ্যের চেয়েও ভয়ংকর এক দৃশ্য ভেসে উঠে। মেঝেতে রক্তের বন্যা। প্রতিটি মেয়ে অচেতনের মতো পড়ে আছে। তারা চিৎকার করছে না। যেন প্রাণ যাওয়ার অপেক্ষাতেই আছে তারা। মজিদ হাওলাদার লাঠি দিয়ে মেয়েগুলোর স্পর্শকাতর স্থানে পাশবিক উল্লাসে আঘাত করছে। তার চেয়ে কিছুটা দূরে দামী একখানা চেয়ারে বসে আমির কিছু কাগজ দেখছে। পাশেই খলিল হাওলাদার বসে আছেন। একটা মেয়ের দেহ ছুরি দিয়ে কেটে বস্তায় ভরছেন। যাতে কেউ দেহ শনাক্ত না করতে পারে। সামনে রয়েছে রাম দা তিনটে। বীভৎস দৃশ্যটি যে কাউকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে। পদ্মজার বেলাও তা হয়। বমি গলায় এসে আটকে যায়। শরীর বেয়ে একটা আগুন ছুটে এসে মাথায় থেমে যায়। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। সে ঝড়ের গতিতে তেড়ে

Kobitor.com

এসে বয়স্ক শয়তান মজিদকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দূরে। মজিদ হাওলাদার উঁবু হয়ে পড়ে যান। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মজিদ মেঝেতে উঁবু হয়ে পড়তেই খলিল উঠে দাঁড়ায়। পদ্মজার চুলের মুঠি টেনে ধরে। সেকেন্ড খানিক পার হতে পারেনি তার আগেই আমির খলিলকে থাবা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এক হাতে জড়িয়ে ধরে পদ্মজাকে। আমিরের ছোঁয়া গায়ে লাগতেই পদ্মজা ছ্যাঁত করে উঠলো। এই ঘৃণ্য মানুষটিকে সে এখন সহ্য করতে পারছে না। আমিরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মেঝে থেকে রাম দা তুলে নিল। আমিরের দিকে রাম দা তাক করে সাপের মতো হিশহিশ করতে করতে বললো,'আমি কিন্তু মেরে দেব। একদম...একদম মেরে দেব।'

পদ্মজার গলা কাঁপছে,শরীর কাঁপছে। চারপাশে রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে আছে। এক পাশে মানুষের দেহের টুকরো! সে ভেতরে ভেতরে ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশ সে নিতে পারছে না। এমন নির্দয়,বর্বর মানুষ ছিল পাক সেনারা। এই কথা সে শুনেছে তার মায়ের কাছে। সে যেন পাক সেনাদের বাঙালি রূপে দেখছে। পদ্মজা অস্থির হয়ে চারপাশ দেখে। মেয়েগুলো কীভাবে বাঁচানো যায়? জানা নেই। কোনো পথ নেই। খলিল পদ্মজার দিকে ছুরি ছুঁড়ে মারার জন্য উদ্যত হয়,তখন আমির হুংকার দিয়ে উঠলো,'শুয়ো** বাচ্চা,হাত নামা।'

কি জঘন্য আমিরের ভাষা,চোখের দৃষ্টি,হুংকার! পদ্মজার গা রি রি করে উঠে। সে আমিরের দিকে রাম দা উঁচু করে বললো,'যারা যারা আছে সবাইকে ছেড়ে দিন। নয়তো...নয়তো আমি...আমি আপনাকে মেরে ফেলবো।'

পদ্মজা ঘামছে। তার কথা এলোমেলো। তার শরীরে অস্থিরতা। একবার এদিকে তাকাচ্ছে,আরেকবার ওদিকে। দিকদিশা হারিয়ে ফেলেছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মাথা কাজ করছে না। বমি ঠেলেঠুলে উপরের দিকে আসছে। আরভিদ দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। রাফেদ তার পিছনে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে কারো উপস্থিতি টের পেতেই পদ্মজা ফিরে তাকালো। সুযোগ পেয়ে আমির পিছন থেকে পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরলো। পদ্মজার হাত থেকে রাম দা ছিনিয়ে নিল। পদ্মজা কিড়মিড় করতে থাকে। মুখ দিয়ে ক্রোধে বের হতে থাকে অদ্ভুত কিছু শব্দ! আমির পদ্মজাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে ধমকে বললো,'এইবার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। থামো।'

পদ্মজা অগ্নি চোখে আমিরের দিকে তাকালো। সে আমিরের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করে। নিজের অজান্তে খামচে আমিরের হাত থেকে রক্ত নিয়ে আসে। ছটফট করতে থাকে। পদ্মজার গা থেকে শাড়ি পরে যায়। ভেসে উঠে শরীরের অনেকাংশ! সম্পর্কে মজিদ,খলিল যাই হোক না কেন আমির জানে তারা কতোটা নিকৃষ্ট। তাদের চরিত্র,চাহনি সব নিয়েই তার ধারণা আছে। তাই সে দ্রুত পদ্মজাকে শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিল। শক্ত করে চেপে ধরলো। আচমকা পদ্মজা বমি করতে শুরু করে। যা ছিটকে পড়ে আমিরের চোখেমুখে। সে চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে। পদ্মজার শরীর নেতিয়ে পড়ে। আমির পদ্মজাকে নিয়ে এওয়ানে(A1) চলে আসে। দূর্বল শরীরেও পদ্মজার তেজ কমে না। আমিরও হারার পাত্র নয়। তার পুরুষালি শক্তির সাথে পদ্মজা পেরে উঠেনি। একসময় পদ্মজা থেমে গেল,ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমির দূরে সরে দাঁড়ায়। এ কি শুরু হয়েছে! তার এই রাজত্বে এমন বিশৃঙ্খলা কখনো হয়নি। পদ্মজার জন্য বার বার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। পদ্মজাকে অন্দরমহলে পাঠানোও সম্ভব না। পদ্মজা যেভাবে রিদওয়ানকে আঘাত করেছে,তাতে আর ভরসা নেই পদ্মজার উপর। যেকোনো মুহূর্তের পদ্মজা হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। একমাত্র সে পারে পদ্মজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আর এই মুহূর্তে তার অন্দরমহলে ফেরা যাবে না। দুই-তিনদিন

Kobitor.com

লাগবে ফিরতে। আমির মনে মনে ভেবে নেয়, বাকি যেকয়টি দিন সে এখানে আছে পদ্মজাকে এক ঘরে বেঁধে রাখবে। কিছুতেই বাঁধন খোলা যাবে না। আমির পদ্মজার দিকে এগোয়। পদ্মজা চিৎকার করে উঠলো,'খারাপ লোক! ঘেন্না হচ্ছে আমার! ঘেন্না হচ্ছে।'
পদ্মজা প্রবল আক্রোশে আমিরের পায়ের কাছে থুথু ফেললো। আমির পদ্মজার দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো। বেঁধে ফেললো দড়ি দিয়ে। তারপর বিছানায় ফেলে পা বাঁধতে বাঁধতে বললো,'ভুল করলে এখানে এসে। এতো নাক না গলালে ভালো থাকতে। সুখে থাকতে।'

পদ্মজা ক্রোধে-আক্রোশে ঘোরে আছে। হাত-পা বেঁধে ফেললেও মুখ তো আছে। পদ্মজা মুখের থুথু দিয়ে বুঝিয়ে দিল,সে আমিরকে সহ্য করতে পারছে না। আমিরের মুখে থুথু পড়তেই তার মাথা চড়ে যায়,'পদ্মজা!'
'আমাকে ডাকবেন না আপনি। পিশাচ একটা।'
'আমি কিন্তু তোমার গায়ে হাত তুলবো।'
'আমি আশা করি না যে,আপনি আমাকে মারবেন না।'

মজিদ আয়েশি ভঙ্গিতে বসে আছেন। তিনি পদ্মজাকে নিয়ে আতঙ্কে আছেন। মনে মনে তিনি পদ্মজাকে কয়েকবার খুন করেছেন,কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়তো সম্ভব না,যতদিন পদ্মজার উপর আমিরের আকর্ষণ আছে। তিনি খলিলকে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন,'আমিররে পদ্মজার কাছ থেকে নিয়ে আয়। ওই মা* ঝি মায়াবিনী। রূপ দিয়ে আমার সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে বশ করে নিবে।'

খলিলের কানে মজিদের কথা গেল না। তিনি রাগে ফুলে আছেন। আমির সবসময় তার সাথে এবং রিদওয়ানের সাথে কুকুরের মতো ব্যবহার করে। দুই বাপ-ব্যাঠা মিলে অনেকবার পরিকল্পনা করেছে,আমিরকে খুন করার। কিন্তু আমিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রখর শ্রবণশক্তি,নিজেকে রক্ষা করার মতো কৌশল ডিঙিয়ে তাকে আক্রমণ করার সাহস কখনো হয়ে উঠেনি। এছাড়া,আমিরের একেকটা চামচা তার মতোই জাত খুনি! তবে খলিল দমেও যাননি। একদিন সুযোগ হবে। সেদিন এক কোপে আলাদা করে দিবেন আমিরের মাথা। তাছাড়া মজিদকেও খলিলের পছন্দ নয়। সব সম্পত্তি আমিরের নামে করে দিয়েছে! মনের ক্রোধ মনেই রয়ে যায়। কাজ করতে হয় আমিরের হয়ে। নিজেরা আর দখল নিতে পারে না। মজিদ হাওলাদার পা দিয়ে খলিলের পিঠে ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন,'খলিল?'
খলিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো,'কও ভাই।'
'যা,আমিররে গিয়ে বল,রায়পুর যেতে। ওদিকে মেলা হচ্ছে।'
'মেলায় ধরা পইড়া যাইবো না?'
'এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। সময় নেই। আর আমির পারবে।'

খলিল এওয়ানে আসে। আমিরকে বলে রায়পুরের কথা। আমির দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে মাফলার দিয়ে মুখ ঢেকে নিল। আর মজিদকে হুমকি দিয়ে বলে গেল, পদ্মজার গায়ে কোনো টোকা যেন না লাগে!
তারপর সাথে নিয়ে যায় রাফেদকে। ট্রলারে আছে মন্ত আর শ্রীভব। পদ্মজা পড়ে থাকে ঘরে। তার চোখ বেয়ে জল নেমে আসে। মাথা ঘুরাচ্ছে খুব। চোখ দুটি বার বার বন্ধ হয়ে আসছে। মন এবং শরীর দুটোর উপর দিয়েই ধকল যাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে। চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পূর্ণা ও প্রেমার মুখ। এই পাপের কবলে যদি পূর্ণা,প্রেমা পড়ে! পদ্মজা চট করে চোখ খুলে। তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। চিন্তায় মাথা ব্যথা বেড়ে যায়।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ক্লান্ত চোখদুটি খুললো পদ্মজা। ঘরে প্রবেশ করে রিদওয়ান। তার ঠোঁটে হাসি। পদ্মজার পাশে এসে বসে। পদ্মজা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। রিদওয়ান হেসে বললো,'এই দিনটার অপেক্ষা করছিলাম অনেকদিন ধরে।'
পদ্মজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। রিদওয়ান বললো,'আমির কি ঠকানোটাই না ঠকালো তোমাকে।'
রিদওয়ান দাঁত বের করে হাসলো। হাসি দেখে মনে হচ্ছে সত্যি আজ তার সুখের দিন। সে তো এটাই চেয়েছে। পদ্মজা জেনে যাক সব। রিদওয়ান বললো,'তোমাকে অনেক সংকেত দিয়েছিলাম। যাতে আমিরকে চিনে ফেলতে পারো। কিন্তু তোমার আগে সেই সংকেত আমিরের চোখে পড়ে যেত। কি কপাল আমিরের! দুনিয়ায় সব সুখ নিয়েই ও জন্মেছে।'
পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'আপনি কেন চাইতেন? আপনি তো এই দলেরই।'
'দলের তো বাধ্য হয়ে। দেখো,আমি তোমাকে আগে পছন্দ করেছি সেই হিসেবে আমার তোমাকে পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কে পেয়েছে? আমির! যে একজন নারী অত্যাচারী, নারী ব্যবসায়ী,খুনি,শয়তান।'
'শয়তান তো আপনিও।'
'আমি শয়তান হলে তোমার কী যায় আসে? তোমার স্বামী হলে-
'এখানে কেন এসেছেন?'
'গল্প করতে।'
'মেয়েগুলোকে মারা হচ্ছে কেন?'

রিদওয়ান মুচকি হেসে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে সব বলার জন্যই এখানে এসেছে। পদ্মজা ও আমির প্রতিদ্বন্দ্বী হলে তার যে আনন্দ হবে সেই আনন্দ বোধহয় বেহেশতেও নেই। এটা রিদওয়ানের ভাবনা। তাই তো সে যখনই শুনলো,আমিরের উপস্থিতি এখন নেই। সঙ্গে,সঙ্গে অসুস্থ শরীর নিয়েই পদ্মজার কাছে চলে এসেছে। রিদওয়ান ধীরেসুস্থে জানালো এই পাতালঘরের ইতিহাস। দুশো বছর পুরনো এই পাতাল ঘর। আগে মন্দির ছিল। মন্দিরের নিচে পাতালঘর বানানো হয়েছিল। সেখানে সোনার মূর্তি ছিল। মূর্তির গায়ে ছিল হীরা,পান্না। তখনকার আমলের রাজার দায়িত্বে ছিল এই পাতালঘর। তারপর সেটা কোনোভাবে হাওলাদার বাড়ির হয়ে যায়। সোনার মূর্তিও নাই হয়ে যায়। তার খোঁজ কেউ জানে না। তখনের প্রজন্মে হাওলাদার বংশের একজন পুরুষ ছিলেন নারী আসক্ত। তিনি যখন বাড়ির পিছনে এমন একটা পাতাল ঘরের সন্ধান পেলেন,মাথাচাড়া দিয়ে উঠে নারী আসক্তি। তারপর থেকেই মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করে, খুন করা হয়ে উঠে প্রতি দিনকার অভ্যাস। আস্তে আস্তে এই পাপ ছড়িয়ে পড়ে বংশের সব ছেলেদের মধ্যে। পাতালঘর তাদের মনে নিষিদ্ধ, মহাপাপের বাসনা জাগিয়ে তুলে। আস্তে আস্তে ধর্ষণের সাথে সাথে নারী বিক্রি শুরু হয়। শুরু হয় পতিতাবৃত্তি। লম্পট ক্ষমতাশালীরা অর্থ দিয়ে নারী ভোগ করতে আসতো পাতালঘরে। এই পাপ মজিদ হাওলাদার অবধি একই ভাবে চলে আসে। আমির হাওলাদার সেটাকে বিদেশ অবধি নিয়ে যায়। টাকার পাহাড় গড়ে তুলে। পাতালঘরকে করে তুলে আধুনিক। বানায় আরো কয়েকটি ঘর। চারিদিকের নিরাপত্তা শক্ত করে। প্রতি বছরের শীতে এবং বর্ষাকালে কয়েকটি মেয়েকে ধরে এনে হাওলাদার বাড়ির পুরুষেরা নিজেদের পুরুষত্বের ক্ষমতা প্রমাণ করে। তারপর চৌদ্দ দিন ধরে একটানা তাদের করা হয় নির্মম অত্যাচার। চৌদ্দ দিনের মধ্যে অনেকে মারা যায়। আবার অনেকে বেঁচে থাকে। যারা বেঁচে থাকে তাদের কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর লাশের গায়ে,পাথর বেঁধে ট্রলারে করে ডুবিয়ে দেয়া হয় সব বড়,বড় নদীতে। আর

বছরে চারবার নারী পাচার করা হয় বিদেশে। পুরো বছর জুড়ে খোঁজ চলে নারী শিকারের। এ পাপ হাওলাদার বাড়ির রক্তে মিশে গিয়েছে। বয়স পনেরো হতেই বাড়ির ছেলেদের জড়িয়ে দেয়া হয় এই চক্রের সাথে। এ যেন হাওলাদার বংশের রীতি! ছেলে হয়ে জন্মালে এই রীতি অনুযায়ী চলতেই হবে! সব শুনে পদ্মজা পায়ের তালু থেকে মাথার চুল অবধি কেঁপে উঠে! দুশো বছর ধরে চলছে এই পাপ! কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি! অথচ,এই হাওলাদার বাড়ির সুনাম সব জায়গায়। হিন্দুরা হাওলাদার বাড়ির পুরুষদের দেবতার সাথে তুলনা করে,আর মুসলিমরা ফেরেশতার সাথে! অথচ এদের রক্তেই শয়তানের বসবাস। এই তবে এই বাড়ির রহস্য! এজন্যই কি মেয়ে হওয়ার পর সৃষ্টিকর্তা তাকে বন্ধ্যা করে দেয়! আমির...আমিরও কী নারী আসক্ত! এটাই তো স্বাভাবিক! হাওলাদার বংশের ছেলে হয়ে নারী ভোগ করেনি এমন ভাবনা মানায় না! পদ্মজার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসে। বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করতে থাকে। বার কয়েক ঢোক গিলে। রিদওয়ান পদ্মজার অস্থিরতা টের পেয়েছে। তার পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছে। সে খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বললো,'এবার চলো ছয় বছর পূর্বে ফিরে যাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যেতে। যেদিন আমির আর তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল।'

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৬৬

"সেই ঝড়ের সন্ধ্যেতে। যেদিন আমির আর তোমার প্রথম দেখা হয়েছিল" বাক্য দুটি পদ্মজার নিঃশ্বাস থামিয়ে দিল। রিদওয়ান বিছানা ছেড়ে চেয়ার টেনে বসলো। বললো,' আমির সারাবছরই ঢাকা থাকে। শুধু বর্ষাকাল আর শীতকালে গ্রামে আসে। সেসময় বর্ষাকাল ছিল। মেয়ে যোগাড় হয়ে গেছে। সেই আনন্দে আমির আমার সাথে তাস খেলে। বলে, যদি ওকে আমি হারাতে পারি আমি যা চাইবো তাই দিবে। একটু প্রশংসা করি,আমির শয়তান হলেও কথা দিয়ে কথা রাখার অভ্যাসটা ভালোই ছিল। আমার সৌভাগ্য, আমির সেদিন হেরে যায়। আমাদের আটপাড়া গ্রামের মেয়েদের আমরা কখনো শিকার করি না। এটা আমাদের নিয়ম। নিজের গ্রামের মেয়ে হারালে দূর্নাম হবে বড় চাচার। কারণ তিনি মাতব্বর। আটপাড়ার কোনো মেয়ে আজও আমাদের হাতে পড়েনি। তোমাকে আমি স্কুলে যাওয়ার সময় দেখি। বিশ্বাস করো,আমি তোমাকে যেদিন দেখি সেদিন রাতে ঘুমাতে পারিনি। আব্বাকে বলছি,তোমাকে এনে দিতে। তিনি দিলেন না। আটপাড়ার মেয়ে তুলে আনা যাবে না! কড়া নিষেধ। তারপর অনুরোধ করেছি, যাতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায়। তখন বড় চাচা বললেন, তোমার মায়ের কথা। তিনি মুক্তিযোদ্ধা। গ্রামের অনেকের কাছে শুনেছেন, তোমার মা নাকি মেয়ে বিয়ে দিবেন না। দূর-দূরান্ত থেকে বনেদি ঘরের ছেলেরাও নাকি এসেছে বিয়ের জন্য তাও তিনি বিয়ে দিতে রাজি হননি। কিন্তু আমারতো তোমাকে লাগবেই। তোমার রূপ এমনই যে,সারাজীবন ভোগ করলেও পানসে লাগবে না।'

শেষ কথাটি শুনে রাগে পদ্মজার কপালের চামড়া কুঁচকে যায়। তবে টু শব্দ করলো না। রিদওয়ান বলছে,'আমার এই বাড়ির প্রতি,এই পাতালঘরের প্রতি লোভ অনেক আগে থেকে। তবুও আমি সেসবের কিছু না চেয়ে আমিরের কাছে তোমাকে চেয়েছি। কতোটা পছন্দ করেছি ভাবো একবার? ভাবো পদ্মজা। একটু ভাবো।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে কাতর চোখে তাকালো। তারপর চোখেমুখে ক্রোধ এনে বললো,'কিন্তু হলো কী? নিজে পছন্দ করে ফেললো। আমির আমার জন্য তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমি জানতাম,তোমার আম্মা বাড়িতে নেই। তাই এরপরদিনই আমির তোমাদের বাড়িতে যায়। কথা দিয়েছিল,এশার আযানের আগেই আমার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিবে। ধ-রক্তের বি-থ্রি ঘরে আমি অপেক্ষায় ছিলাম। মাঝরাত অবধি অপেক্ষা করেছি। তারপর অন্দরমহলে চলে যাই। গিয়ে শুনি,আমির বড় চাচাকে হুমকি দিচ্ছে,তোমার সাথে বিয়ে না দিলে নাকি কাজ ছেড়ে দিবে। যদিও সবাই জানি,আমির কোনোদিন তার পেশা ছাড়বে না। তাও বড় চাচা আমিরকে অসন্তুষ্ট রাখতে চান না। তাই কথা দিলেন তোমার সাথেই বিয়ে হবে। যেভাবেই হউক। আমিরের সাথে আমার তর্ক হয়। আমাকে তখনই আদেশ দেয়া হয়, ছইদকে খুন করতে হবে। ছইদ আমিরের সাথে বেয়াদবি করেছে। যা আমিরের গায়ে লেগেছে। ও চায় না ছইদ আর বেঁচে থাকুক। আমিরের আদেশ পালন করতেই হয়। কিন্তু সেদিন আমি শুনিনি। তখন বড় চাচা বললো,'পদ্মজা সমাজের কাছে আমিরের বউ হলেও,ঘরে তোর বউও হবে। আমি তার ব্যবস্থা করব,আমিরের সাথে কথা বলব। '

আমাকে আশা দেওয়া হয়। তাই ছইদকে সরিয়ে দেই। সব কিন্তু তোমাকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু অবাক কান্ড কি জানো? তোমার মাও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা এতো ভয়ংকর আগে বুঝিনি! মেয়ে মানুষ হয়ে কীরকম ভাবে যে নেশাগ্রস্থ দুটি মানুষকে জবাই করেছে তুমি ভাবতেও পারবে না!'

রিদওয়ান থামলো। সে অবাকচোখে পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে। পদ্মজার কোনো ভাবান্তর হলো না। সে জানে এই ঘটনা। চিঠিতে পড়েছে। রিদওয়ান বললো,'তারপরদিন সালিশে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলো। তোমার আম্মাও রাজি হয়ে গেলেন। বলেছি না? আমির দুনিয়ার সব সুখ নিয়ে জন্মেছে। তোমার আম্মা আমাকে চিনতেন না। কখনো দেখলেও বা নাম শুনলেও মুখ মনে নেই। তাই তিনি নিশ্চিন্তে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিলেন। বড় চাচা সমাজের চোখে কতোটা মহান সেটা তুমিও জানো। দুই মাস অন্তর,অন্তর দান করেন। সবার অভাব দূর করেন,চিকিৎসা করান। উনার ছেলের বউ মানে অনেক কিছু! তোমার আম্মাতো আর ভেতরের খবর জানতেন না। সে যাই হোক পরের কথা বলি। আমির যখন শুনলো, তোমার আম্মা দুটো খুন করেছে, ও চিন্তায় পড়ে যায়। আমির ধূর্তবাজ, চালাক। ও মানুষ চিনে। ও তাৎক্ষণিক বুঝে গেল, তোমার আম্মা জটিল মানুষ। তাই আমাকে নিষেধ করলো,বিয়ে বাড়িতে আমার মুখ না দেখাতে। চিনে গেলে সমস্যা হবে। আমিরের সাথে তাল মিলিয়ে বড় চাচাও নিষেধ করলো। আমি তো-

পদ্মজা মাঝপথে প্রশ্ন করলো,'আপনি এই গ্রামের ছেলে! আর আম্মাও এই গ্রামের মেয়ে,বউ। তারপরও আপনাকে চিনতেন না?'

'ওইযে বললাম,কখনো হাওলাদার বাড়ির ছেলে হিসেবে দেখলেও মনে নেই। নয়তো নাম জানতেন মুখ চিনতেন না। তাছাড়া,আমাকে সত্যি অনেকেই চিনে না। নাম জানলে মুখ চিনে না। মুখ চিনলেও,হুট করে দেখে ধরতে পারে না। সবসময় এখানে থাকি। অন্দরমহলে থাকি। রাতে বের হই। ট্রলারে থাকি। এটা খুব সহজ ব্যাপার। তোমার আম্মা চিনতেন না বললে বেমানান লাগবে না। আর শুনেছি, তোমার আম্মা নাকি সমাজের দিকে চোখ দিতেন না তেমন। নিজের সংসার আর তিন মেয়েকে নিয়েই থাকতেন।'
কথাগুলো অবহেলার স্বরে বলে রিদওয়ান থামলো। পদ্মজা কিছু বললো না। রিদওয়ান ভ্রুকুঞ্চন করে বললো,'কোথায় যেন ছিলাম?'

Kobitor.com

পদ্মজা জবাব দিল না। রিদওয়ান মনে করার চেষ্টা করলো। মনে পড়তেই আবার বলা শুরু করলো। আমিরের কথামতো সে হেমলতাকে মুখ দেখায়নি। যায়নি ও বাড়িতে। বিয়ের দুইদিন আগে মেয়েগুলোকে ঢাকা চালান করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আলমগীর আমিরের কথামতো পাচার করে দেয় বিদেশে। মৃত মেয়েগুলোকে ফেলে দেওয়া হয় বড়-বড় নদীতে। একটা মেয়ে রয়ে যায়। সে মেয়েটিকে পদ্মজা আর আমিরের বিয়ের আগের দিন রাতে হত্যা করা হয়। তারপর আমিরের কথামতো, হাবলু আর রিদওয়ান চলে আসে হাওড়ে। অন্দরমহলে তখন আমিরের গায়ে হলুদের উৎসব চলছিল। হাওড়ে তখন তীব্র স্রোত। বাড়ি ফেরার তাড়াও ছিল। আবার মেয়েটি অনেক দূরের। তাই হাবলু মেয়েটিকে নদীর শেষ মাথায় ও হাওড়ের শুরুতে ফেলে দেয়। তখনই খেয়ালে পড়ে,আরেকটি নৌকা। যেখানে মোড়ল বাড়ির পরিবার ছিল। রিদওয়ান ট্রলারের ভেতর ছিল। সে হাবলুকে তাড়া দেয় দ্রুত ট্রলার ঘুরাতে। তারপরের কাহিনি পদ্মজার জানা। পুরোটা শুনে পদ্মজা অবাক হয়ে যায়। সে হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলো,'আর...আর হানিফ মামার ব্যাপারটা?'

রিদওয়ান খুব বিরক্তি নিয়ে বললো,'এসব ছোটখাটো ব্যাপার। ওই শালা আমাদের সাথেরই লোক ছিল। তারপর আধিপত্য দেখানো শুরু করে। টাকা চায় অনেক। আমিরের উপর কথাবলা শুরু করে। হুমকি দেয়। তার চাহিদা বেড়ে যায়। অনেকদিন সহ্য করার পর একদম উপরে পাঠিয়ে দেই।' রিদওয়ান হাসলো। যেন খুব মহৎ একখানা কাজ করেছে। তারপর আবার বললো,'প্রান্তর আব্বা আর আবদুল এদের নিয়েও প্রশ্ন করবে নাকি? এদের কথা জেনে তোমার লাভ নেই। দুইজনই সব জেনে ফেলার কারণে মরেছে। সহজ হিসাব। প্রান্তর বাপ আমিরের হাতে,আবদুল আমার হাতে। এসব বাদ দেও। আমরা আমিরের কথাতে যাই। তোমাকে শুধু আমিরের গল্প শোনাব।'

রিদওয়ান কাছে কথাগুলো যেন কত স্বাভাবিক! যেন মশা মারার গল্প বলছে! পদ্মজা ভীষণ অবাক হচ্ছে। এই হাওলাদার বাড়ির আঁচ তার গায়ে এতো আগে থেকেই লেগেছিল! হানিফকে খুন করতে গিয়ে তার মা খালি হাতে ফিরে আসে। তারপরদিন হানিফের লাশ পাওয়া যায়। অথচ,তার মা খুন করেনি। প্রান্তর বাপ খুন হয়। প্রান্ত মুন্না থেকে প্রান্ত হয়ে উঠে,তাদের ভাই হয়ে উঠে। আমির শিকার করতে এসে তার প্রেমে পড়ে যায়। বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের আগেরদিন রাতে নদীতে লাশ পাওয়া যায়। তারপর অবশেষে বিয়ে হয়! সবকিছু এক সুতোয় গাঁথা! এ কেমন যোগসূত্র! পদ্মজার মাথা ভনভন করতে থাকে। এতদিন একটা চক্র তার আশেপাশে শব্দ তুলে ঘুরঘুর করছিল । সে শব্দ ঠিকই শুনেছে তবে তার উপস্থিতি ধরতে পারেনি। রিদওয়ান বললো,'বিয়ের দিন রাতে বড় চাচার কথায় ভরসা রেখে তোমাকে ছুঁয়েছিলাম। ভেবেছিলাম,আমির কিছু বলবে না। কিন্তু হলো কি? সে তো তোমার রূপে একেবারে কুপোকাত।
তারপরের ঘটনাও বোধহয় জানো। আমির আষ্টেপৃষ্ঠে তোমাকে আগলে রাখা শুরু করে। একসময় বিভিন্ন কার্যকলাপে তোমার সন্দেহ হতে থাকে। এই ব্যাপারটা আমিরকে চিন্তায় ফেলে দেয়। পাহারাদার বাড়িয়ে দেয়। তোমার উপর নজর রাখার জন্য রেখে দেওয়া হয় লতিফাকে। তাই আমিরের সাজানো দেয়াল ভেঙে পৌঁছাতে পারোনি পাতালঘরে। তোমার আম্মা নাকি চোখের দৃষ্টি দেখে,মানুষ চিনতে পারেন? কার মুখ থেকে জানি আমির শুনেছিল। ব্যাপারটাকে গুরুতর ভাবে নিয়ে নেয় আমির। সে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। তোমার আম্মাকে নিয়ে একটু ভয়েও ছিল। মহিলার চাহনি,কথাবার্তা খুব বেশি ধারালো আর সজাগ। আমির পরিকল্পনা করে,তোমার আম্মার গলাটা আলাদা করে দিবে। মাঝপথে কাঁটা রাখা ভালো না। এটা কিন্তু আমার কথা না। আমিরের কথা।'

রিদওয়ান পদ্মজার মুখের ভঙ্গি দেখার জন্য তাকালো। পদ্মজার চোখ দুটি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। আমির হাওলাদার তার মাকে খুন করতে চেয়েছিল! রিদওয়ান পদ্মজার মেজাজ আঁচ করতে পেরে বললো,' এমনকি খুন করতেও গিয়েছিল।'
পদ্মজা চকিতে তাকাল। তার চোখে জল টলমল করছে সেই সাথে লাল হয়ে উঠেছে। রিদওয়ান বললো,'ঘটনাটা তোমার বিয়ের কয়দিন পরের। সেখানে গিয়ে জানতে পারলো,তোমার আম্মার কি এক রোগ হয়েছে। মরে যাবে,সব ভুলে যাবে। সম্ভবত তোমার আম্মা তোমার আব্বার সাথে কথা বলছিল। আমার ঠিক মনে নেই। অনেক আগের ঘটনাটা তো। তাই আমির তার পরিকল্পনা বাদ দিল। কয়দিন পর তোমাকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে । এখন আর এসব করে লাভ নেই। কয়দিন পর এমনিতেই মরে যাবে। তবে যদি না মরতো তাহলে কিন্তু আমিরই খুন করতো। এই হলো তোমার সোহাগের স্বামী।'

রিদওয়ানের ঠোঁটে তিরস্কারের হাসি। কি যে আনন্দ হচ্ছে তার! শুধু পদ্মজা জানে তার কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে। আমিরের প্রতি রাগ,ঘৃণা নিঃশ্বাসের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এই মুহূর্তে যদি তার হাত,পায়ের বাঁধন খোলা থাকতো তবে সে রিদওয়ানের এই গা জ্বালা হাসি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে,আমিরকে শেষ করে দিত। রিদওয়ান হইহই করে উঠলো,' আরে আরো বাকি আছেতো। থেমে গেলেতো চলবে না। যেদিন তোমার মেট্রিক পরীক্ষার ফলাফল দিল,সেদিন তোমার আম্মা প্রথম আমাদের বাড়িতে আসেন। আর আমাকে দেখে চিনে ফেলেন। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী মহিলার মস্তিষ্ক নাড়া দিয়ে উঠে। তিনি তোমাকে নিয়ে ভয় পান বোধহয়। আমি রাতে দ্বিতীয় তলায় হাঁটছিলাম রুম্পা ভাবির ঘরটা নজরে রাখার জন্য। ধীরে,ধীরে হাঁটছিলাম তাও সেই শব্দ তোমার মায়ের কানে চলে যায়। তিনি বেরিয়ে আসেন। আমাদের কথা হয়। উনি তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভেঙে পড়েন। মা হিসেবে এমনটাই হওয়ার কথা। শেষ রাতে আমি আর আমির ছাদে ছিলাম। আচমকা দেখি, তোমার আম্মা জঙ্গলের ভেতর ঢুকছেন। কত সাহস! মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে প্রথমবার এসেই সন্দেহ করে পুরো বাড়ি ঘুরা শুরু করেছেন! বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই। জঙ্গলের ভেতরই আমাদের সব। তখন এতো নিরাপত্তা ছিল না। তাই আমির ছুরি নিয়ে তোমার মায়ের পিছু ধাওয়া করে। লক্ষ্য ছিল,যখনই তোমার আম্মা টের পাবে কিছু। তখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু তোমার আম্মা পুরো জঙ্গল ঘুরেও কিছু ধরতে পারেননি। এটা তোমার আম্মার ভাগ্য! নয়তো ওখানেই মরতে হতো। এখানেই কিন্তু সব শেষ নয়। তোমরা ঢাকা যাওয়ার পর উনি আরো দু-দুবার লুকিয়ে এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। দুইবারই হাবলু উনার পিছু নিয়েছে। আমি আমিরকে চিঠি লিখি। তখন আমির জানালো,আরেকবার তোমার আম্মা যদি এখানে আসে সঙ্গে সঙ্গে যেন মৃত্যু উপহার দিয়ে দেই। কিন্তু তিনি আর আসেননি। কিছু না পেয়ে বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন,এখানে কিছু নেই। এই বাড়িতে গোপন কিছু নেই। নয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছু একটা হবে জানি না অতো। তোমার মায়েরও ভাগ্য ভালো! দুইবার মেয়ের জামাইয়ের হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি,দুইবার হাবলুর মতো জাত খুনির হাতে খুন হতে গিয়েও হয়নি। উনার মৃত্যুটাই লেখা ছিল রোগে। সে যাই হোক। দেখো, আমির জানতো তোমার মা তোমার কতোটা প্রিয়। তবুও কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখেছে। তোমার মাকে খুন করতে চেয়েছে। এমন মানুষকে তুমি ভালোবেসেছো! রাগ হচ্ছে না ভেবে?'

পদ্মজা নির্বাক,বাকহারা। তার ভেতরে বিন্দুমাত্র ভালোবাসার অনুভূতি যেন নেই। রিদওয়ান আবার বলতে শুরু করলো,'আমির তোমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী আর বোনের বিয়ের জন্য এখানে আসেনি। তুমি ভেবেছো, সব কাজকর্ম ফেলে শুধু তোমার মন রাখতে এসেছে। এটা মিথ্যা। ও

এখানে এসেছে বিপদে পড়ে। কুয়েত থেকে বড় অংকের টাকা অগ্রীম নিয়েছে ছয় মাস আগে। বিনিময়ে ত্রিশটা মেয়ে দিতে হবে। মেয়েগুলোর গায়ে একটু দাগও থাকতে পারবে না। মেয়ে দেয়ার কথা ছিল এক মাস আগেই। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি,পারিনি। সব মানুষ চালাক হয়ে গেছে। এমন কখনো হয়নি। এইবার সব ওলটপালট হয়ে গেছে। আমির এর উপর চাপ আসতে থাকে। ও টাকাগুলোও খরচ করে ফেলছে। কী করছে কে জানে। কুয়েত থেকে হুমকি এসেছে,আরো এক মাসের মধ্যে ত্রিশটা মেয়ে দিতে না পারলে আমাদের সম্পর্কে সব প্রমাণ বাংলাদেশ পুলিশ ঐক্যতে পাঠাবে। যেভাবেই হউক আমাদের ধ্বংস করবে। ওরা খুব ক্ষমতাশালী। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের সাথে তাদের চক্র শামিল আছে। আমরা সবাই এখন একটা ঝড়ে আছি। বিশেষ করে আমির আর ওর বাপ। তাই আমির এখানে এসেছে। এক মাস শেষ হওয়ার আর বারোদিন বাকি। মেয়ে পাচার করতে হবে আটদিন পরই। মেয়ে যোগাড় হয়েছে নয় জন। যেভাবেই হউক আমাদের একুশটা মেয়ে লাগবেই। তাই এখন খুব চাপ। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে উপস্থিত তুমি!'
রিদওয়ান শব্দ করে হাসলো। তার হাসি যেন থামছে না। পদ্মজা তীক্ষ্ণ স্বরে বললো,'ধ্বংসের লক্ষণ শুরু হয়েছে। দুশো বছর চলেছে আর কত চলবে!'
'কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। আমিতো দেবই না। আমার জীবনে কিছু বলতে শুধু এই অংশটাই আছে। বেঁচে থাকার একটাই অংশ।'
'যে মেয়েগুলোকে মেরেছেন তাদের না মেরে পাচার করেই দিতে পারতেন। সেটা কেন করেননি?'
পদ্মজার ভেতরে অপ্রতিরোধ্য তুফান চললেও। কণ্ঠ শান্ত। রিদওয়ান স্বাভাবিক স্বরেই জানালো,কেন তারা এই মেয়েগুলোকে পাচার করতে পারছে না। মেয়েগুলো দুই মাস ধরে এখানে আছে। প্রথম পনেরো দিন বীভৎস ধর্ষণে এদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে,শরীরে বিভিন্ন দাগ বসে গেছে। তখন তারা জানতো না,তাদের মেয়ের অভাব পড়ে যাবে। তারপরও এক মাস ঔষধপত্র দিয়ে মেয়েগুলোর ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করেছে। হয়নি। তাই বিগত পাঁচদিন ধরে তারা তাদের রীতি অনুসারে মেয়েগুলিকে পিটাচ্ছে। আজ দুটো মেয়ে মারা গেছে। আগে লাশই ফেলে দেয়া হতো। পাঁচ বছর ধরে টুকরো,টুকরো করা হয়। এটাও আমিরের বুদ্ধি। যাতে কোনো মানুষের চোখে না পড়ে,আর পুলিশও শনাক্ত করতে না পারে। পুলিশরাও এখন চালাক হয়ে গেছে।

পদ্মজা বললো,'আমি মেয়ে পাচার করতে দেব না।'
'কী করবে?'
পদ্মজা নিশ্চুপ।
'কিছুই পারবে না। আমির তোমাকে ছেড়ে দিলেও আমরা ছাড়ব না। আর আমিরও তোমাকে ছাড়বে না। ও তোমার শরীরে আকৃষ্ট। ভালোবাসে না। যেদিন তুমি রুম্পার ঘরে রাতে ছিলে সেদিন আমির তোমার খেয়াল রাখার জন্য না,তোমার উপর নজর রাখার জন্য রাতে ঘুমায়নি। রুম্পা কখন কী বলে দেয় সেই ভয়ে। রুম্পাকে খুন করার পরিকল্পনাও আমিরের। ও বাবলুকে পাঠায়। হাবলুর ভাই বাবলু। দুজনই বংশগত জাত খুনি। কিন্তু গিয়ে দেখে আলমগীর ভাইয়া তার বউকে নিয়ে পালাচ্ছে। তবুও বাবলুর সাথে ওরা পারতো না। সেখানে তুমি বাগড়া দাও। বাবলুকে খুন করে ফেলো! কী আশ্চর্য! একদম মায়ের রূপ পেয়েছো। পুরোটা দৃশ্য কিন্তু আমির দেখেছে। ও জঙ্গলে ছিল। এতো,এতো চিন্তার মাঝে তোমার এই রূপ! তুমি যখন পূর্ণাকে নিয়ে অন্দরমহলে চলে যাও,তখন লাশ সরিয়ে দেয়া হয়। তুমি পূর্ণাকে নিয়ে ঘরে যাও তখন আমির তোমাদের ঘরে চলে যায়। এমনকি আমিরের জ্বরও হয়েছিল,মেয়ে যোগাড়ের চিন্তায়। এমন অবস্থায় তোমার খুনাখুনির কাজকর্ম আমিরকে পাগল করে তুলে। অস্থির হয়ে পড়ে। রানিকে খোঁজার নাম করে

এখানে এসে পরিকল্পনা করে,তোমাকে ভয় দেখানোর। যাতে তুমি ঢাকা চলে যাও আমিরকে নিয়ে। ওর বিশ্বাস আটদিনে মেয়ে যোগাড় করে ফেলবে। কিন্তু এটা বিশ্বাস নেই যে, তুমি আট দিন পর ঢাকা যেতে রাজি হবে। তাই আগে থেকে কাজ এগিয়ে রাখার পরিকল্পনা করে। এমনকি তোমাকে মারতেও বলেছে। যাতে ভয় পাও। মারার পরও যখন ভয় পাওনি। তারপর বললো,তোমাকে রক্ত দেখাতে। যদিও একটা মেয়ের রক্ত দেখিয়েছিলাম তোমাকে। ওর বিশ্বাস ছিল,স্বামীর জানের মায়ায় হলেও ছেড়ে দিবে এই গ্রাম। কিন্তু তুমিতো মুখের উপর বলে দিলে,ঢাকা ফেরত যেতে রাজি না তুমি। এই সত্যি তুমি আমিরকে ভালোবাসো? ভালোবাসা কী?'

পদ্মজা দাঁতে দাঁত চেপে চোখের জল ফেলছে। রিদওয়ান দুই হাত নাড়িয়ে বললো,'আচ্ছা,এসব ভালোবাসা-টালোবাসার কথা বাদ দেও। আমির তোমাকে ভালোবাসে না। সব ওর নাটক। ও তোমার রূপকেই ভালোবেসেছে। এখনও যে রূপের শরীর তোমার! আমিই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। সেখানে তো ও হালালভাবে ভোগ করার সনদ পেয়েছে। সবশেষে, ভালোভাবে বলছি পদ্মজা। কোনো বাগড়া দিও না আর। সব মেনে নাও। নয়তো তোমাকে মরতে হবে। আমির না মারলেও বড় চাচা,আব্বা আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।'

'তিনি কেন আমাকে মারবেন না? তিনিতো আমাকে ভালোবাসেন না।'

'ভালো না বাসলেও টাকার প্রতি যেমন টান ওর তেমন সুন্দরের প্রতি টান আছে। ধরে রাখতে চাইতেও পারে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, অনেক করেছো আর কিছু করো না।'

'কী পান এসব করে?'

'অর্থ পাই। শান্তি পাই।'

'মেয়েদের কষ্ট দিয়ে কীসের শান্তি? হাওলাদার বংশে ভালো ছেলে নেই? সবই খারাপ?'

'যারা ভালো হয়েছে তারা মরেছে। তবে জাফর ভাই,আলমগীর এরা তো ভালো। এদের অনেক পিটিয়েও বড় চাচা,আব্বা এই পথে আনতে পারেনি। জাফর ভাইতো এই সম্পর্কে কিছুই জানে না। জাফর ভাই একটু বোকা ধরণের। অনেক স্পর্শকাতর মন। মুরগির রক্ত দেখলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই তাকে আর এই জগতে আনা হয়নি। আব্বার প্রথম ছেলে ছিল বলে মারেনি। রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয় পড়ার জন্য। তারপর বিয়ে করে বাইরেই চলে গেল। আর আলমগীর ভাইয়া বাধ্য হয়ে এই দলে কাজ করেছে। সুযোগ পেয়ে পালিয়েও গেছে। আমিরতো ছোট থেকেই তেজি। বড় চাচার কাছে আমির হচ্ছে সোনার টুকরা। এসব গল্প করতে ভালো লাগছে না। ঘাড়টা খুব ব্যথা করছে। এতো শক্ত আঘাত দিয়েছো। ডাইনি নাকি তুমি?'

রিদওয়ান আলতো করে ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললো,'আচ্ছা,আসল কথা বলি, আমিরকে ছেড়ে পালিয়ে যাও। এই রাজত্বে থাবা দেয়ার কথা ভেবো না। জীবনে কিছু পাইনি। মা জন্ম দিয়ে মারা গেল। বাপের অবৈধ সন্তান আমি। ছোট থেকে আমি অত্যাচারিত। আজও আমির আমার উপর অত্যাচার করে। অনেক দূর্বল ছিলাম। পানিতে চুবিয়ে রেখেছে,শীতের রাতে উলঙ্গ করে বেঁধে রেখেছে। পিটিয়েছে। আমির মানুষকে আঘাত করতে পছন্দ করে। মানুষের আকুতি-মিনতি ওর কাছে পরম শান্তির। তুমি ওর কাছে থেকো না। পালিয়ে যাও। পুলিশের কাছে যেও না। অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। ও এখন মায়া দেখাচ্ছে। যখন স্বার্থে বেশি টান পড়বে ঠিকই হাত তুলবে। খুন করে ফেলবে তোমাকে।'

পদ্মজা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে বললো,' কি বলছেন! তাহলে উনি আপনার কাহিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন!'

রিদওয়ান পদ্মজার কথা বুঝতে পারলো না। সে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলো,'কিছু বললে?'

পদ্মজা কিছু বলতে পারলো না। তার চোখ থেকে জল পড়ছে। পিছনের ছয় বছর মিথ্যের জাল দিয়ে প্যাঁচানো! কিছু সত্য নয়। সব মিথ্যে। সব!

আমির মাত্রই এসেছে। এখন শেষরাত। সে পানি খেয়ে রাফেদকে বললো,'নতুন মেয়ে তিনটাকে খেতে দিও। চিৎকার, চেঁচামেচি করলে ভুলেও মেরো না।'
রাফেদ বললো,'আপনি ভাববেন না। সব সামলে নেব।'
আমির বিটু(B2) ঘরে বসে রয়েছে। মজিদ বললো,'আমরা যাই তাহলে। সকালে কাজ আছে আমার।'
আমির কিছু বললো না। কপাল কুঁচকে রেখেছে। সিগারেট ধরালো। খলিল বললো,'ওই ছেড়িরে এহন কী করবি?'
আমির বললো,'এটা আমার ব্যাপার। আরভিদ?' উঁচু স্বরে ডাকলো।
আরভিদ সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে আসলো। আমির বললো,'বাড়ির পিছনে যাও। লতিফা থাকবে। যা দিবে নিয়ে আসবে।'
আরভিদ চলে গেলো। আমির চেয়ারে বসে মজিদকে বললো,'গেলে যাও। দাঁড়িয়ে আছো কেন? শফিক না আসছিল,কোথায় গেল?'
'রিদুর কাছে গেছে।' বললেন খলিল। তারপর মজিদরে বললেন,'আইয়ো ভাই। বাড়িত যাই।'

পদ্মজা ক্লান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো,'ঢাকার অফিস আর গোডাউনে আমি তো অনেকবার গিয়েছি। সেখানে পণ্য দেখেছি। মেনু দেখেছি। কিছুতো মিথ্যে মনে হয়নি।'
'আমিরের সত্যি পণ্যের ইমপোর্ট ব্যবসা আছে। ও কাঁচা কাজ করে না।'
'আর আমার মেয়ে? আমার নিষ্পাপ তিন মাসের মেয়েটাকে কে খুন করেছে? বাবলু করেছে?'
রিদওয়ান এই প্রশ্নে থমকায়। পদ্মজা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে এই প্রশ্নের জবাবের জন্য। দরজায় টোকা পড়ে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে প্রবেশ করলো একটা চেনা মুখ। রিদওয়ান হেসে বললো,'আরে শফিক। শেষরাতে এখানে?'
শফিক পদ্মজাকে জহুরি চোখে দেখলো। শফিকের এলোমেলো চুল,নোংরা চাহনি। সে রিদওয়ানকে বললো,'হু,আসছি। আগে বল,আমিরের বউ এখানে কেন? এই মেয়েরেও চালান করে দিবে নাকি?'
'নিজে নিজেই চলে এসেছে। কোনো বিপদ? থানার কী অবস্থা?'
'তোরা কি আজমপুর থেকে কোনো মেয়ে এনেছিস? আজমপুরের মাতব্বর মামলা করেছে। তার মেয়ে হারিয়ে গেছে। বিশাল বড়লোক। বড়লোকদের ব্যাপার স্যাপার তো জানিসই। আশেপাশের সব এলাকাতেই খোঁজ চলছে। আগামীকাল অলন্দপুরেও পুলিশ আসবে। তাই তোদের জানাতে এসেছি। সাবধানে থাকিস।'
'দুনিয়ার সব ভেজাল একসাথে এইবারই আসতেছে।' ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো রিদওয়ান।

শফিক তার গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে পদ্মজাকে পা থেকে মাথা অবধি দেখলো। তারপর পদ্মজার পায়ের কাছে বসলো। পদ্মজার ফর্সা পা দুটিতে তার নজর পড়ে। পায়ে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বললো,'খুব সুন্দরী। কাছ থেকে প্রথম দেখলাম। মেরেই তো দিবে নাকি?'
শফিকের ছোঁয়া যেন পদ্মজার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিল। সে হুংকার ছাড়লো,' একদম ছোঁয়ার চেষ্টা করবেন না। দূরে সরুন।'
শফিক অবাক হয়ে রিদওয়ানকে বললো,'আরে এর তো তেজ অনেক। আমির সামলায় কেমনে?'

রিদওয়ান ঠোঁট কামড়ে হাসি আটকিয়ে রেখেছে। তার সাহস হচ্ছে না পদ্মজাকে ছোঁয়ার। কিন্তু অন্য কেউ আমিরের দূর্বলতায় হাত দিচ্ছে দেখে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। সে শুধু দৃশ্যটা উপভোগ করছে। শফিক শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বললো,'এতো সুন্দর মেয়ে হাতছাড়া করা যায় না। মেরেই যখন দেয়া হবে একটু উপভোগ করে দেখি কী বলিস?'

পদ্মজার বুক ধুকপুক করছে। শেষমেশ তার ইজ্জতেও হাত পড়ছে। সে ছটফট করতে থাকে ছোটার জন্য। পদ্মজা বাঁধা অবস্থায় উল্টা হয়ে ছিল। শফিক সোজা করে। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজার মসৃণ,পাতলা পেট উন্মুক্ত হয়ে উঠে। শফিকের লোলুপ দৃষ্টি দেখে পদ্মজার শরীর রি রি করে উঠে। সে প্রাণপণে ছোটার চেষ্টা করছে। শফিক উল্লাসে বললো,' আরে ভাই, এমন সুন্দর মেয়েমানুষ তো দুটো দেখেনি। আমিরের উচিত ছিল আমাদের সাথে ভাগ করে নেয়া। একাই ছয় বছর - আচ্ছা যাক। তুই এখানে বসে থেকে দেখবি? দেখলে দেখতে পারিস।'

শফিক আরো অশ্লীল মন্তব্য করে। যা শুনে পদ্মজার ঘৃণায় বুক ফেটে কান্না আসে। শফিক পদ্মজার উপর ঝুঁকতেই পদ্মজা চেঁচাতে থাকে। এক দলা থুথু ছুঁড়ে দেয় শফিকের মুখের উপর। শফিকের চোখ দুটি বড় বড় হয়ে যায়। প্রবল আক্রোশে পদ্মজার আহত গালে থাপ্পড় বসায়। পুরনো ক্ষতস্থানের পুরো চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। ব্যথায় পদ্মজার সারা শরীর টনটন করে উঠে। আর্তনাদ করে উঠে 'আম্মা' বলে। তখনই দুটি পায়ের শব্দ ভেসে আসে। কেউ একজন দৌড়ে এদিকে আসছে। রিদওয়ান আমিরের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত ভয়ে চেয়ার থেকে উঠে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। ঘরে এসে প্রবেশ করলো আমির। রিদওয়ানের ধারণাই সত্যি। আমির পদ্মজার চিৎকার শুনেই চলে এসেছে। আমির এখানে আছে জানলে রিদওয়ান শফিককে নিষেধ করতো। শফিকও তো বলেনি! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়!

শফিক আমিরকে দেখে হাসলো। বললো,'আমির এই বউ তো-

চোখের পলকে সেই হাসি মিলিয়ে যায়। কথা বলাও থেমে যায়। আমির থাবা মেরে ধরে শফিককে। রিদওয়ান দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এটু(A2) ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। শফিক কিছু বুঝে উঠার পূর্বে আমির ছুরি দিয়ে শফিকের গলার রগ কেটে ফেলে। রক্ত ছিটকে পড়ে পদ্মজার উপর। আমির নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে শফিকের দুই চোখে আঘাত করে। পেটে,বুকে আঘাত করে। শফিকের মাথা দুই হাতে ধরে দেয়ালে শব্দ তুলে আঘাত করে। শফিকের মুখ থেকে গ্যার-গ্যার ধরণের একটা শব্দ বেরিয়ে আসে। সেই শব্দ আর আমিরের বিশ্রি গালিগালাজে পদ্মজা ভীত হয়ে পড়ে। রক্তে সারা ঘর রক্তপুরী হয়ে উঠেছে। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। সে কখনো আমিরকে খুন করতে দেখেনি। আজই প্রথম দেখছে। কী নির্মম তার খুন করার ধরণ। কী হিংস্র তার চাহনি,তার আক্রমণ! চোখের পলকে মানুষ খুন করে ফেলেছে! পদ্মজা চোখ বুজে জোরে জোরে কাঁদতে থাকলো।আমিরের সারামুখে রক্ত। চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাপাচ্ছে না। দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো মজিদ,খলিল,রাফেদ,আরভিদ।

মুহূর্তে চারিদিক থমকে যায়। থেমে যায় সব শব্দ। শফিকের রক্তাক্ত দেহটি মেঝেতে পড়ে আছে। চোখ দুটি যেন বেরিয়ে এসেছে। গলার রগ থেকে ছিটকে রক্ত বের হচ্ছে। যেকোনো সাধারণ মানুষের কাছে এই দৃশ্য দেখা মানে ওই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করা। গড়গড় করে বমি করা। পদ্মজার সারা শরীর কাঁপছে। এমন মানুষের সাথে সে কিছুতেই পারবে না। মুহূর্তের ঘটনায় সে হার মেনে

নিয়েছে। মনেপ্রাণে নিজের মৃত্যু চাইছে। এই মুহূর্তে মনে ভয় ছাড়া আর কিছু নেই।ভালোবাসা,রাগ,ঘৃণা,ক্রোধ কিছু নেই। সে শুধু ভয় পাচ্ছে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ
(অনেক হয়েছে রক্তারক্তির গল্প! এবার নতুন মোড় ধরতে হবে।)

আমি পদ্মজা- ৬৭

____

আমির হাতের ছুরি চেয়ারের উপর রাখলো। তারপর রক্তমাখা জ্যাকেট খুলে মেঝেতে ফেললো। পদ্মজা ভয়ে মিইয়ে গেছে। অস্বাভাবিকভাবে ফোঁপাচ্ছে। খলিল যত দ্রুত সম্ভব জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন। মজিদ তীব্র বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে বিকৃত রূপ ধারণ করলেন। শফিক তাদের কতো কাজে লাগতো,সেটাও শেষ! পদ্মজাকে তার শুরু থেকেই অপছন্দ। মেয়েটার রূপের আড়ালে তিনি আগুন দেখতে পান। যে আগুন আমিরকে ঘায়েল করে তাদের নিঃশেষ করে দিবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমিরকে কিছু বলে লাভ নেই। পরে সময় করে বোঝাতে হবে। মাথায় অনেক চিন্তা নিয়ে তিনিও জায়গা ত্যাগ করলেন। আমির তার গায়ের শার্ট খুলে হাত-মুখের রক্ত মুছে,পদ্মজার দিকে এগিয়ে আসলো।
পদ্মজা আমিরের দিকে তাকানোর সাহস অবধি পাচ্ছে না। সে খুনের দৃশ্যটি বার বার দেখছে। মনে হচ্ছে,এই বুঝি আমির তার চোখ দুটি... না ভাবা যাচ্ছে না! পদ্মজা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো। আমির ছুঁতেই দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমির দুই সেকেন্ডের জন্য থামে। তারপর জোর করে পদ্মজাকে বসালো। পদ্মজার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে,সঙ্গে পদ্মজা বিছানার এক কোণে চলে গেল। সে স্থির হতে পারছে না। তার মন,শরীর ভীষণভাবে অস্থির হয়ে আছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। আমির অনেকক্ষণ পদ্মজার ভয় পাওয়া দেখলো। তারপর ডাকলো,'পদ্মজা।'
পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখেছে। সে আমিরের ডাকে সাড়া দিল না। আমির উঁচু কণ্ঠে বললো,'তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? আমি তোমাকে কিছু করবো না।'
তাও পদ্মজা তাকায় না। তার শরীর বিরতিহীনভাবে কাঁপছে। আমির বিছানায় উঠে আসে। জোর জবরদস্তি করে পদ্মজাকে নামিয়ে আনে বিছানা থেকে। ধমক দেয়। পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসে এ ফোর(A4) ঘরে। এ ঘরটা অন্যরকম। সাধারণ ঘরের মতো। পদ্মজাকে বিছানায় রাখতেই, পদ্মজা আমিরকে জোরে ধাক্কা দিল। কিন্তু অদ্ভুত! তার ধাক্কায় আমির এক আঙ্গুলও নড়েনি। আমিরকে পদ্মজার আর স্বামী মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে দানব। একটা দানব দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সে মুক্তির জন্য ছটফট করছে আর কাঁদছে। আমির পদ্মজাকে স্থির করার চেষ্টা করে। পদ্মজা কিছুতেই স্থির হয় না। সে তার মাকে খুঁজছে। মুক্তি চাইছে। ভয়ে তার শরীর শীতল হয়ে গেছে। বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কাঁদছে। আমিরের ধৈর্য্য ভেঙে যায়, জোরে ধমকে উঠে,'কান্না থামাও। থামাও বলছি।'

পদ্মজা কান্না থামানোর চেষ্টা করে। ভয়ার্ত চোখে আমিরের দিকে তাকায়। আমির আসার সময় আরভিদকে দেখেছে। আরভিদের হাতে একটা ব্যাগ ছিল। সে পদ্মজাকে রেখে দরজার কাছে এসে আরভিদকে ডেকে ব্যাগ নিল। ব্যাগে পদ্মজার ঔষধপত্র,শাড়ি,ব্লাউজ,সোয়েটার,শাল রয়েছে। যখন বের হয়েছিল তখন বাইরে লতিফা দাঁড়িয়ে ছিল। ফরিনা পাঠিয়েছেন পদ্মজার

খোঁজ নিতে। নয়তো তিনি খাবেন না। তাই লতিফা বাধ্য হয়ে এসেছিল। আমির লতিফাকে দেখে রেগে যায়। লতিফাও ভয় পেয়ে যায়। তবে আমির রেগে কিছু বললো না। শুধু প্রশ্ন করলো কেন এসেছে? তারপর উত্তর দিয়ে দিল,পদ্মজা ভালো আছে। একটা ব্যাগে যেন পদ্মজার দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে দেয়া হয়। শেষ রাতে যেন বাড়ির পিছনে অপেক্ষা করে। আর দুইদিন থাকা হবে এখানে। দুটো দিন পদ্মজাকে চোখের আড়াল করা যাবে না। লতিফা শেষ রাতে ব্যাগ নিয়ে আসে। আমির লতিফার কথা ভুলে যায়। তারপর যখন মনে পড়ে,আরভিদকে পাঠায়। আমির ব্যাগ থেকে শাড়ি,ব্লাউজ বের করে বিছানার এক পাশে রাখলো। পদ্মজাকে বললো,'তখন বমি করেছো,এখন আবার রক্তও লেগেছে। পাল্টে নাও।'

আমিরের কণ্ঠ শান্ত,স্বাভাবিক। কিছু মুহূর্ত আগের ঘটনার কোনো ছাপ নেই তার মুখে। সে পদ্মজার জবাবের জন্য অপেক্ষা করে। পদ্মজা জবাব দেয় না। তার ফোঁপানো ধীরে ধীরে কমে আসে। ফিরে আসে তার স্থির স্বভাবে। পদ্মজার গাল থেকে রক্ত ঝরছে। আমির তুলা এনে কিছুটা বিছানায় রাখলো,আর কিছুটা দিয়ে পদ্মজার গালের রক্ত মুছার জন্য পদ্মজার এক হাত ধরে তার দিকে ফেরানোর চেষ্টা করতে চাইলো, তখনই পদ্মজা ছ্যাৎ করে উঠে দূরে সরে যায়,চোখ বড় বড় করে বললো,'দূরে থাকুন।'
'রক্ত ঝরছে তো।'
'আমারটা আমি দেখে নিতে পারবো।'
পদ্মজা বাকি তুলাটুকু নিজের গালে চেপে ধরলো। আমিরের আর কি বলার! সে পদ্মজার সাথে কথা বাড়ানোর সাহস পায় না। বিছানার চেয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে কাঠের চেয়ারে বসলো। দুজন দুইদিকে বসে থাকে চুপচাপ। নিস্তব্ধ,শান্ত পরিবেশের জন্য পদ্মজার নিঃশব্দে কান্না করাটা শুনতে পাচ্ছে আমির। সে কথা বলতে গিয়ে দেখলো,তার কথা ফুটছে না। আরো দুইবার চেষ্টা করার পর কথা ফুটল,'কী করবে ভেবে পাচ্ছো না? অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে?'
পদ্মজা আগুন দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। কটাক্ষ করে বললো,'আনন্দ হচ্ছে আপনার?'
'আনন্দ হওয়ার কী আছে?'
'কিছু নেই?'
'না।'
'ওই লোকটিকে খুন করে নিজেকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন?'
'নিজেকে ভালো প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তোমার কাছে ভালো হতে পারবো?'
পদ্মজা থমকাল। সময় নিয়ে বললো,'আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছেন। আপনি আমাকে একটার পর একটা মিথ্যা বলেছেন। আর অন্যদের সাথে নৃশংসতার কথা না হয় বাদই দিলাম। তারপরও আমি আপনাকে ভালো মনে করব?'
'সেটাই তো বললাম।'
তীব্র ঘৃণায় পদ্মজা মুখ ফিরিয়ে নিল। আমির বললো,'এসব কে বলেছে?'
'মিথ্যে তো বলেনি।'
'রিদওয়ান?'
'সত্য তো?'

আমির উত্তর দিল না। পদ্মজা বললো,'আমার নিজেকে নর্দমার কীট মনে হচ্ছে। আপনার মতো একটা মানুষের সাথে এতদিন বসবাস করেছি আমি।'
'গোসল করে পরিষ্কার হয়ে যাও।'

'মজা করছেন?'
'না।'
'তারপর তো ঠিকই ছুঁবেন। জোর করে অপবিত্র করে দিবেন। পুরুষ তো আপনি। পেরে উঠবে না কোনো নারী। নারী তো ভোগের জিনিস। ভোগ করে করে ফেলে দেওয়ার জিনিস।'
আমিরের কপালে ভাঁজ পড়ে। বললো,'কবে তোমাকে জোর করেছি?'
'আপনাকে ভালোমানুষ ভেবে,স্বামী ভেবে কখনো জোর করার সুযোগ দেইনি।'
'ভালোবেসে না?'
'দয়া করে,ভালোবাসার নাম মুখে নিয়েন না। আমার রূপে পাগল আপনি। আমার মতো সুন্দর মেয়ে আপনি দুটো দেখেননি এজন্য রেখে দিয়েছেন। বিয়ে করেছেন। হালাল সনদের অধিকারে ভোগ করেছেন। আমার এই সৌন্দর্য যদি না থাকতো, কবেই ছুঁড়ে দিতেন আবর্জনায়।'
'রূপ নিয়ে অহংকার করছো? পাগল হয়ে গেছো তুমি।'
'তাই করছি। আপনার ভাই রিদওয়ানের মনোরঞ্জনের জন্য আমাকে তুলে আনতে গিয়েছিলেন। নিজের বউকে অন্যজনের ভোগের জন্য আনতে গিয়েছিলেন।'
আমির হাসলো। হেসে বললো,'তখন তুমি আমার বউ ছিলে? দেখার পর হয়েছো।'
আমিরের হাসি পদ্মজার রাগ আরো কয়েনগুণ বাড়িয়ে তুললো,'আমার এই সুন্দর মুখ না থাকলে আমার জায়গা কি আপনার বিলাসবহুল বাড়িতে হতো? স্থায়ী রক্ষিতা হিসেবে?'
'তোমার মনে হচ্ছে না,তুমি বাড়াবাড়ি করছো? তোমার সাথে এমন কথাবার্তা যায় না।'
'আপনি তো আমাকে আমার জায়গায় থাকতে দিলেন না। আমাকে আপনার স্তরেই নামতে হবে এখন। নয়তো বাঁচবো কী করে? কয়দিন পরতো আমার বোনদের উপরও আপনার হাত পড়বে। ব্যবসায় বিপদে পড়েছেন তো।'
'আটপাড়ার মেয়েদের-
পদ্মজা আমিরের কথা কেড়ে নিয়ে বললো,'জানি আমি। কিন্তু সেই নিয়ম ভেঙে আপনি আমাকে ঠিকই তুলে আনতে গিয়েছিলেন। মেয়ের প্রয়োজনে আমার বোনদের উপর হাত দিবেন না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? যেখানে আপনি আমার মাকে খুন করতে চেয়েছিলেন।'
'তোমার বোনদের উপর কখনো কোনো আক্রমণ আসবে না। তুমি খুব বেশি কথা বলছো।
'শরীরের শক্তির সাথে তো পেরে উঠি না।'
'তাই কথা বলে মাথা খাচ্ছো?'
'আপনার মরে যেতে ইচ্ছে করে না? এতো খারাপ কাজ করার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয় না? মনে হয় না,এইবার থামা উচিত?'
আমির মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো। বললো,'অনেক কথা বলেছো। এইবার গোসল করে, খাওয়াদাওয়া করে আমাকে সুযোগ দাও।'
'কীসের সুযোগ?'
'তোমাকে বাঁধার। আমাকে বের হতে হবে আবার।'
পদ্মজা অন্যদিকে ফিরে বসে। যার অর্থ সে গোসল করবে না। তার অসহ্য লাগছে আমিরকে। আমিরের খুন করার অভিজ্ঞতা দেখে হাতাহাতি করার সাহস মরে গেছে। এখন থেকে যা করতে হবে,পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে। নয়তো সে কিছুতেই পারবে না। মেয়েগুলোর মুক্তির আকুতি করে যে লাভ নেই সেটাও বুঝে গেছে। আমির চেয়ার ছেড়ে উঠে আসলো।। খপ করে পদ্মজার হাতে ধরলো। বললো,'যাও গোসলে।'
'ছাড়ুন!' কিড়মিড় করে বললো পদ্মজা।

'গোসলে যাও। গোসল করে খাওয়াদাওয়া করে,ওষুধপত্র খেয়ে আমাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করো।'
'নাটক করছেন কেন?'
'নাটক তো তুমিও করছো। যেভাবে কথা বলছো এটা তো তুমি না।'
'উফফ! ছাড়ুন।'
'আমাকে বাধ্য করো না,তোমাকে গোসল করিয়ে দিতে।'
পদ্মজা বিস্ফোরিত হয়ে তাকালো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো,'তখনই আমি মরে যাবো।'
'সেজন্যই বলছি,নিজে যাও।'
'আমি আপনার কথা শুনবো না।'
'আমার হাতের মার কিন্তু খুব শক্ত। নরম আছি নরম থাকতে দাও।'
'অন্যজনকে দিয়ে মার দিয়েছেন,এবার নিজে মারাটা বাকি। মেরে দিন না, এখুনি মেরে দিন।'
'আমি কাউকে মারতে বলিনি। কিন্তু এরকম চলতে থাকলে,তুমি আমার হাতে শক্ত আঘাত পাবে।'
পদ্মজার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। সে ভেজাকণ্ঠে বললো,'সেদিনটাও যে আমাকে দেখতে হবে আমি জানি। তাহলে এখন কেন দরদ দেখাচ্ছেন? নাটক করছেন কেন?'
'পদ্মজা আমার দেরি হয়ে যাবে। সময়টা আমার কাছে খুব মূল্যবান। দুই দিন ধরে ঘুম হচ্ছে না। মাথা চড়ে আছে,কথা শুনো।'

পদ্মজা কিছু বলার মতো খুঁজে না পেয়ে,থুথু ছুঁড়ে মারলো। আকস্মিক ঘটনায় আমির হতভম্ব। পদ্মজা কথায়,কথায় থুথু ছুঁড়ে দিচ্ছে। যা অপমানজনক। কিন্তু আমির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। সে পদ্মজাকে জোর করে টেনে নামালো। বললো,'গোসলে যাও।'
'গায়ের জোর দেখাচ্ছেন?'
'দেখাচ্ছি।'
'ছয় বছর তো জোরই দেখিয়েছেন।'
'তোমার সম্মতিতে।'

পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকালো। শান্ত,গভীর ক্লান্ত দুটি চোখ। হিংস্রতার বিন্দুমাত্র রেশ নেই। খাড়া নাক,পাতলা ঠোঁটে হালকা গোলাপি ছাপ। থুথুনিতে কাটা দাগ। এলোমেলো চুল,কপালে দারুণ দুটো ভাঁজ। উত্তপ্ত চেনা নিঃশ্বাস মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় প্রাণের স্বামীর কথা। কত কত আদর,সোহাগ,ভালোবাসার ছন্দ এই মানুষটিকে ঘিরে। ঘৃণার মোটা দেয়াল ভেঙে ভালোবাসার অনুভূতিটা কী অদ্ভুতভাবেই ছুঁয়ে ফেললো পদ্মজাকে। তখনই কানে ভেসে আসে রিদওয়ানের কথাগুলো,ভেসে আসে মেয়েদের চিৎকার। চোখের সামনের রঙিন পর্দাটা সরে গিয়ে হয়ে উঠে ক্রোধী। পদ্মজা চাপাস্বরে আমিরকে জানায়,'শেষ অবধি আমি পদ্মজাই থাকবো।'
আমির পদ্মজার স্বরেই বললো,'পারবে না। আমার সাথে তুমি পারবে না। বিশ্বাস করো,গায়ের জোরে,বুদ্ধির খেলায় আমার সাথে পারবে এমন মানুষ জন্মিয়েছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তবে কোনো অনুভূতি জন্মালেও জন্মাতে পারে।'

আমিরের শেষ কথাটা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে। কোনো অনুভূতি কি তলোয়ারের চেয়েও ধারালো হয়? সত্যি কি অনুভূতি কারো ধ্বংসের কারণ হতে পারে? তাহলে সেই অনুভূতি পদ্মজা কোথায় পাবে? যে অনুভূতি দিয়ে আমিরকে নিঃস্ব করে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠানো যাবে। শেষ হবে দুশো বছরের পাপ। আমিরের পদ্মবতী হয়ে উঠবে শুধুমাত্র পদ্মজা।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা -৬৮

____
পদ্মজার শরীর ঘামে ভিজে একাকার। প্রচণ্ড গরম লাগছে। সকালে খুব ঠান্ডা ছিল। সোয়েটার পরার পরও তার শরীর কাঁপছিল। তাই আমির পদ্মজার গায়ে শাল পেঁচিয়ে দিয়েছিল। তারপর তো আমির বেরিয়েই গেল। এখন পদ্মজা গরমে ঘামছে। সময়টা দুপুরবেলা। সূর্য আজ অনেক তেজ নিয়ে আকাশে উঠেছে। পদ্মজার হাসঁফাঁস লাগছে। গরমে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে কোমরও যেন অবশ হয়ে গেছে। আশেপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভোরের দিকে মেয়েদের চিৎকার কানে এসেছিল। পদ্মজার কিছু করার ছিল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে। খট করে দরজা খুলে যায়। পদ্মজা চোখ তুলে তাকালো। আমির এসেছে! পরনে ফুলহাতা সাদা গেঞ্জি। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আমির পদ্মজার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর শাল সরাতে চাইলে,পদ্মজা বাঁধা দিয়ে বললো,' আমি পারবো।'
আমির সরে দাঁড়ালো। পদ্মজা গা থেকে শাল বিছানায় রেখে সোয়েটার খুললো। তারপর কাঠ কাঠ গলায় বললো,'দয়া করে আমাকে আর বাঁধবেন না।'
'নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার স্বভাব আমার নেই।'
'বসে থাকতে,থাকতে আমার কোমরের হাড় ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।'
'দুই-তিনদিন বসে থাকলে হাড় ক্ষয় হয় না।'
পদ্মজা হতাশ হয়ে বললো,''আমার যন্ত্রণা হয়। ঝিমঝিম করে পা।'
আমির ঘরের এক কোণে থাকা কাঠের বক্সের দিকে এগোতে এগোতে বললো,'মামার বাড়িতে আসোনি যে,যেভাবে চাইবে সেভাবেই হবে।'
'একুশটা মেয়ে কি জোগাড় হয়ে গেছে?' আচমকা পদ্মজার এমন প্রশ্ন,তাও শান্ত কণ্ঠ।
আমির বক্সের তালা খুলে একটা ছুরি বের করলো। পদ্মজার জবাব দিল স্বাভাবিককণ্ঠে,'এতো সহজ নাকি! এতসব রিদওয়ান কেন যে তোমাকে বললো!'
'আপনি আমার মাকে কীভাবে মারতে চেয়েছিলেন?'
'পথের কাঁটা রাখতে নেই।'

পদ্মজা চমকে গেল,আহত হলো। আমির কত সহজভাবে তার মাকে উদেশ্য করে বললো 'পথের কাঁটা রাখতে নেই।' পদ্মজা কথা বলার মতো আর মন পাচ্ছে না। কষ্টও যেন সয়ে গেছে। শুধু তীক্ষ্ণ চোখে আমিরের পিঠের উপর তাকিয়ে রইলো। আমির উঁবু হয়ে কী যেন খুঁজছে। দরজা খোলা। পদ্মজা পরিকল্পনা করলো,সে এখন এক দৌড়ে ধ রক্তে চলে যাবে। যে ভাবনা সেই কাজ, এক পা এক পা করে পিছিয়ে যায়। আমির না দেখেই পদ্মজার উদ্দেশ্যে বললো,' পালাতে পারবে না।'
পদ্মজা থমকে দাঁড়াল। বললো,'পালাচ্ছি না।'
আমির উঠে দাঁড়াল। পদ্মজার দিকে তাকিয়ে বললো,'তো কোথায় যাচ্ছো?'
পদ্মজা বিছানায় এসে বসলো। তার মাথা কোনো কাজই করছে না। এখানে কোনো পথই নেই। সব পথ যেন বন্ধ করা। সে ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো,' আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করছি না। করবও না। আমাকে বাঁধবেন না অনুরোধ।'
'ছলনার পথ নিতে চাইছো?'

'ছলনা করবো কেন? টয়লেটে যেতে পারি না,শুতে পারি না। স্বামীর নতুন বাড়িতে এসেছি তো নাকি? একটু শান্তি তো দিবেন।'
'অভিনয়ে খুব কাঁচা তুমি। হচ্ছে না। ভালো করে অভিনয় করো নয়তো যা বলার সোজাসুজি বলো।'

পদ্মজা থতমত খেয়ে গেল। সে সোজাসুজি আর কিছুই বললো না। এক রাত চলে গেছে। মানে আর সাতদিন বাকি। কিছু করতে পারবে তো! আমির বক্স থেকে একটা বস্তু হাতে নিল। পদ্মজার দিকে ফিরে বললো,'যদি এটা ধরতে পারো তোমার বসা,শোয়া সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।' কথা শেষ করেই বস্তুটি পদ্মজার দিকে ছুঁড়ে মারলো। পদ্মজা ধরে ফেললো। আমির আবার বক্সের দিকে ফিরলো। বললো,'দারুণ। আমি আমার কথা রাখবো।'

পদ্মজা বস্তুটির এক মাথা ধরে টান দিতেই একটা ছুরি বেরিয়ে আসে। সে অবাক হয়ে আমিরের দিকে তাকালো। আমির মনোযোগ দিয়ে কি যেন খুঁজেই চলেছে। পদ্মজা তাৎক্ষণিক ভাবলো,ছুরি দিয়ে সে আমিরকে ভয় দেখাবে। ভয় দেখিয়ে সবগুলো মেয়েকে বাঁচিয়ে ফেলবে। তার উত্তেজিত মস্তিষ্ক গভীরভাবে কিছু আর ভাবলো না। পরিস্থিতিকে পানির মতো সহজ ভেবে,সে ধীরে,ধীরে এগিয়ে গেল। আমির আড়চোখে খেয়াল করলো, পদ্মজা আসছে। আর তার হাতে ছুরি। তাও আমির নড়লো না। ওইভাবেই রইলো। আমির যখন একটু দূরে তখন পদ্মজা হাঁটা থামিয়ে দৌড়ে এসে আমিরের গলায় ছুরি ধরে বললো,'সবগুলো মেয়েকে ছেড়ে দিন নয়তো আমি আপনাকে মেরে ফেলবো।'
আমির হাসলো। বললো,'পদ্মজা,এখানে শুটিং হচ্ছে না।'
পদ্মজা অপ্রস্তুত হয়ে আছে। তবুও সে ভাঙা গলায় হুংকার ছেড়ে বললো,' যা বলছি করুন।'
আমির নাছোড়বান্দা স্বরে বললো,'করব না।'
পদ্মজার আশার পাহাড় দুই ভাগ হয়ে যায়। তবুও সে হার মানার মেয়ে নয়। বললো,'আমাকে সহজ ভাববেন না। আমি কিন্তু স্বামী বলে ছেড়ে দেব না।'
'এতো লম্বা হয়ে লাভ কী হলো? স্বামীর গলায় ছুরি ধরতে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিতে হচ্ছে তোমার। এবার পায়ের পাতা মাটিতে ফেলো নয়তো আঙুল ভেঙে যাবে।'
পদ্মজা দাঁতে দাঁত কিড়মিড় করে বললো,'গতকাল থেকে আপনি আমার সাথে মশকরা করে যাচ্ছেন।'
আমির চমৎকার কৌশলে তার জায়গায় পদ্মজাকে নিয়ে আসে আর পদ্মজার জায়গায় সে চলে আসে। শুধু ছুরিটা আলাদা। আমির বললো,'তোমার হাতের ছুরি দিয়ে সুতাও কাটা যাবে না। ভোঁতা ছুরি। খেয়াল না করেই আমাকে আক্রমণ করতে চলে এসেছো। মশকরা আমি করছি নাকি তুমি? বাচ্চাদের মতো আচরণ করছো। বুদ্ধি হাঁটুতে চলে এসেছে। গতকালের শফিকের মৃত্যুটা তোমাকে তোমার জায়গা থেকে নড়বড়ে করে দিল, সেখানে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছো! বোকা মেয়ে। এখন আমি যদি তোমার গলার শিরাটা কেটে ফেলি? আমার হাতের ছুরি কিন্তু ভোঁতা না।'

পদ্মজার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যায়। আমির এমনভাবে চেপে ধরে ছুরি ধরেছে যে, মনে হচ্ছে এখুনি আমির তার প্রাণ নিয়ে নিবে। কিন্তু আমির সেটা করলো না। পদ্মজাকে আলগা করে দিল। পদ্মজা ছাড়া পেয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। আমির বললো,'আগে ঘোর কাটিয়ে নিজের অবস্থানে ফিরে আসো।'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

কথা শেষ করে যখনই আমির বের হবে তখন পদ্মজা প্রশ্ন করলো,'এতো মন্দ ভাগ্য কেন হলো আমার?'

আমির জবাব না দিয়েই চলে গেল। পদ্মজা মেঝেতে বসে,ডুকরে কেঁদে উঠলো। সে কোনদিকে যাবে,কী করবে? দিকদিশা পাচ্ছে না। এতো ভেবেও কোনো কূলকিনারা পেল না। আমির যদি তাকে বেঁধে না যায় তবে সে কিছু করার চেষ্টা করতো। কিন্তু সেটা কখনোই হবে না। আমির বোকা না। সে খুব সতর্ক এবং চালাক। পদ্মজা কান্না করা ছাড়া করার মতো আর কিছু পাচ্ছে না। নিজের কপাল চাপড়ে শুধু কান্না করারই সুযোগ আছে এখানে। আমির হ্যান্ডকাপ নিয়ে আসলো। পদ্মজার হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দিল। পদ্মজা কিছু বললো না,আমিরও বললো না। হ্যান্ডকাপ পরিয়ে আমির তার মতো চলে গেল। বের হওয়ার পূর্বে আরভিদকে বললো,'পদ্মজার হাতে হ্যান্ডকাপ পরানো আছে। যদি এখানে হাঁটাহাটি করে কিছু বলো না। আমি বড় দরজায় নতুন তালা দিয়েছি। চাবি একটা আর সেটা আমার কাছে। যা ই করুক,বের হতে পারবে না।'
আরভিদ বললো,'যদি আমাকে আক্রমণ করে?'
'ও হাত ছাড়া কাউকে আক্রমণও করতে পারে না। তাই নির্ভয়ে থাকবে। যা ইচ্ছে করুক পাত্তা দিবে না। মনে করবে,পিঁপড়া ঘোরাঘুরি করছে।'
আরভিদ বললো,'জি,স্যার।'
'মেয়েগুলোকে খাবার দিবে। আমার আসতে অনেক রাত হবে।'
'জি,স্যার।'
আমির রাফেদকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। যাওয়ার পূর্বে ভালো করে সবকিছু দেখে নিলো। পদ্মজা দ্বারা তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো পথ আছে নাকি! নেই! আমির নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যায়। পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। আচমকা তার খেয়াল হলো,তার হাত বন্দি কিন্তু পা বন্দি না। দরজাও খোলা। সে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে আসলো বাইরে। চারিদিক নির্জন,থমথমে। সে আগে প্রতিটি ঘর দেখলো। এটুতে(A2) রিদওয়ান ঘুমাচ্ছে। বাকি ঘরগুলো খালি। সে পা টিপে,টিপে স্বাগতম দরজা পেরিয়ে ধ-রক্ত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ধ-রক্তের মানে সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে,ধর্ষণ এবং ধ্বংস থেকে নেয়া ধ। রক্তটা বোধহয় এদের মনের আনন্দ। তাই নামকরণ হয়েছে,ধ-রক্ত। পদ্মজা দরজা ধাক্কা দিতেই আরভিদ সামনে এসে দাঁড়ালো।

মৃদুল সাইকেল নিয়ে বড় সড়কে পূর্ণার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা রায়পুর মেলায় যাবে। আজ শেষ দিন। পূর্ণার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে রায়পুর মেলায় যাওয়ার। কিন্তু হেমলতা কখনো মেলায় যেতে দেননি। তিনি সবসময় ভীড় থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছেন। পূর্ণা তার বন্ধুদের কাছে শুধু শুনেছেই কখনো যায়নি। কথায় কথায় যখন মৃদুলকে সে বললো তার ইচ্ছের কথা। মৃদুল তাৎক্ষণিক পূর্ণাকে জানালো,'আমি তোমারে নিয়া যামু। কাইল দুপুরে বড় সড়কে আইসা পড়বা। বোরকা পইরা আসবা। '
মৃদুল অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠে। তখন দূরের ক্ষেতে দেখা যায় পূর্ণাকে। কালো বোরকা পরা। আপাদমস্তক ওড়না দিয়ে ঢেকে রাখা। মাথার উপর তুলে রেখেছে নিকাব। সড়কের দুই পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত। ক্ষেতের আইল ধরে ছুটে আসছে পূর্ণা। ওড়নার আংশিক অংশ বাতাসে উড়ছে। মৃদুল মনোমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণা মৃদুলের কাছে এসে হাঁপাতে থাকলো। হাঁপাতে,হাঁপাতে বললো,'অনেক দেরি হয়ে গেছে তাই না? বড় আম্মা আসতেই দিচ্ছিল না।'
মৃদুল পূর্ণার পাতলা ত্বকের মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো,'কী বইলা আইছো?'

'কিছুই না। বলেছিলাম,সুরুজ চাচার বাড়িতে যাব। তখন বললো,কোথাও যাওয়া-যাওয়ি নাই। আপা জানতে পারলে নাকি বড় আম্মার উপর রাগবে। তাই না বলেই চলে এসেছি।'
'চিন্তা করব তো।'
'না বলে কতবার বের হয়েছি। কিছু হবে না।'
মৃদুল তাড়া দিয়ে বললো,'তাইলে তো হইলোই। তাড়াতাড়ি উঠো। যাইতে সময় লাগব।'
পূর্ণা এতক্ষণে সাইকেল খেয়াল করলো। সে বললো,' সাইকেলে করে যাব?'
মৃদুল ফিরে তাকাল। বললো,'তাইলে কী দিয়া যাইবা? হাঁইটা গেলে বাড়ি আইতে আইতে আজকে সারা রাইত লাগব।'

মৃদুলের পিছনে থাকা খালি জায়গাটায় পূর্ণা তাকাল। মৃদুলের খুব কাছে। আর এখানে বসলে মৃদুলের পেট জড়িয়ে ধরতে হবে। ভাবতেই পূর্ণার হাড় হিম হয়ে আসে। এতদিনের পরিচয়ে একজন আরেকজনের হাতও ধরেনি। আর আজ এতো কাছে বসে পেট জড়িয়ে ধরতে হবে! পূর্ণা ঢোক গিলে মিনমিনিয়ে বললো,'সাইকেল দিয়ে যাব না আমি।'

মৃদুলের ভ্রূযুগল বেঁকে যায়। সে ধমকে উঠে,'নাটক করতাছো কেন? তাড়াতাড়ি উঠো। আর মুখটা ঘুরো। মানুষ দেখব।'

সূর্যের কিরণ এসে পড়ে মৃদুলের চোখেমুখে। স্নিগ্ধ, চকচকে ফর্সা মুখের সাথে বেঁকে যাওয়া দুটি ভ্রূ কী সুন্দর করেই না মানিয়েছে! পূর্ণা সেদিকে চেয়ে থেকে কিছু বলতে পারলো না। নিকাব দিয়ে মুখ ঢেকে মৃদুলের পিছনে বসলো। মৃদুল মৃদু হাসলো, যা চোখে পড়লো না পূর্ণার। মৃদুল সাইকেলের চাকায় পা দিতেই পূর্ণা খামচে ধরে মৃদুলের শার্ট। মৃদুলের সর্বাঙ্গে একটা অজানা,অচেনা সুন্দর অনুভূতির উথালপাতাল ঢেউ উঠে। পূর্ণার বুকে দ্রিম দ্রিম শব্দ হচ্ছে! নিঃশ্বাস এত বেশি এলোমেলো হয়ে পড়ে যে,পূর্ণার মনে হচ্ছে এখুনি সে মারা যাবে। মৃদুল আটপাড়া পার হয়ে, পূর্ণার উদ্দেশ্যে বললো,'কাঁপতাছো কেন?'
পূর্ণা কিছু বলতে পারলো না। কী লজ্জা! সে কাঁপছে সেটাও মৃদুল টের পাচ্ছে। পথের দুই দিকে যতদূর চোখ যায় বিস্তীর্ণ মাঠ। কোথাও কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণা দূরে চোখ রেখে চুপ করে রয়েছে। মৃদুল বললো,'পূর্ণা?'
এ কেমন মায়াময় ডাক! পূর্ণার হৃদয়ে উঠা অপ্রতিরোধ্য তুফান বেড়ে যায়। বুকে এতো জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে কেন? যদি মৃদুল শুনে ফেলে! সে তো লজ্জায় মরেই যাবে। মৃদুল আবার ডাকলো,'পূর্ণা?'
পূর্ণা জুবুথুবু হয়ে উত্তর দিল,'কী?'
'আমার হাত পা অবশ হইয়া যাইতাছে কেন?'
'আমারও।'
সাইকেল থেমে গেল। মৃদুল পূর্ণাকে বললো,'নামো।'
পূর্ণা নামলো। মৃদুল বললো,'সাইকেল দিয়া আর যাওয়া যাইবো না। দূরে থাকা ভালা। তোমার ছোঁয়া বিজলির মতোন বাইরিতাছে আমারে।'
মৃদুলের কথা শুনে পূর্ণার খুব হাসি পেলো। সে হাসি আটকে রাখলো না। হেসে ফেললো। যদিও হাসি দেখা যায়নি। তবে মৃদুল বুঝতে পারলো,পূর্ণা হেসেছে। সে মুখ ভার করে বললো,'হাসো,হাসো। হাসবাই তো। আরেকটু হলে মরেই যেতাম।'
পূর্ণা সশব্দে হেসে উঠলো। মৃদুল বললো,' হইছে আর হাসা লাগব না। হাঁটো। মাঠের মাঝখান দিয়া যাই কী বলো? তাইলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। বললো,'সাইকেল কী করবেন?'
'হাত দিয়া ঠেলে নিয়া যাব।'
দুজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রায়পুর চলে আসে। মেলায় ঢুকতেই আছরের আযান পড়ে যায়! পূর্ণার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে ভীত কণ্ঠে বললো,'আছরের আযান পড়ে গেছে। বাড়ি কখন যাব? একটু পর তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আসুন,চলে যাই।'
'মাত্র তো আইলাম। কিছু কিইনা এরপর যামুনে।'
'দেরি হয়ে যাবে।'
'খালি চুড়ি আর লিপস্টিক হইলেও নিয়া যাবা। আসো।'

মৃদুল শক্ত করে পূর্ণার হাত ধরলো। এই প্রথম মৃদুল হাত ধরেছে! সঙ্গে,সঙ্গে পূর্ণার মনে হয়,চারিদিকের সব ভীড়,কোলাহল থমকে গেছে। থমকে গেছে নাগরদোলার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ! পূর্ণার মনের আঙিনা জুড়ে নৃত্য শুরু হয়। সে ভুলে যায়, তার বাড়ি ফেরার তাড়া! মৃদুল যেদিকে নিয়ে যায়,সেদিকে ছুটে যায়। চারিদিকে কত শব্দ,কত মানুষ,রঙ-বেরঙের কত শাড়ি,গহনা,চুড়ি। কিছুই পূর্ণার চোখে পড়ছে না। শুধু অনুভব করছে,একটা পুরুষালি শক্ত হাত তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। মনে মনে এই মানুষটাকে সে ভালোবাসে! রঙিন,রঙিন স্বপ্ন দেখে। এই সমাজ বিয়ের বাজারে সাদা-কালোর ভেদাভেদ করবে জেনেও সে ভালোবাসে। গায়ের রঙ মেনে কী আর ভালোবাসা হয়! মৃদুল একটা চুড়ির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আট ডজন চুড়ি কিনলো। পূর্ণা মানা করেছে,মৃদুল শুনেনি। চুড়ি কেনার পর মৃদুল বললো,' অন্যকিছু দেখো। নূপুর নিবা না?'

পূর্ণা মাথা নাড়াল। সে নূপুর নিবে। সে একটা,একটা করে নূপুর দেখা শুরু করলো। মৃদুল এক ডজন সুতার চুড়ি হাতে নিল। চুড়িগুলো নিজের চোখের সামনে ধরলো। চুড়ির গোল ফাঁকা অংশে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। নিকাব মাথার উপর তুলে রাখা। চিকন নাকে নাকফুলটা জ্বলজ্বল করছে। পূর্ণা একজোড়া নূপুর হাতে নিয়ে মৃদুলের দিকে তাকালো। মৃদুল দ্রুত চুড়ি সরিয়ে নিল। অন্যদিকে তাকালো। পূর্ণার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে।
কথা ছিল শুধু চুড়ি,লিপস্টিক কিনে চলে যাবে অথচ মৃদুল পারলে পূর্ণার জন্য পুরো মেলাটাই কিনে ফেলে। পূর্ণা মৃদুলের পাগলামি দেখে অবাকের চরম পর্যায়ে। এতকিছু নিচ্ছে! সব জিনিস রাখার জন্য বড় ব্যাগও কিনেছে! পূর্ণা মৃদুলকে চাপা স্বরে প্রশ্ন করলো,'এত কিছু কেন নিচ্ছেন?'
মৃদুল বললো,'জীবনে প্রথম আম্মার জন্য শাড়ি,জুতা কিনছিলাম। আজ যখন আবার সুযোগ পাইছি মেয়ে মানুষের জন্য কেনাকাটা করার,কিনতে দেও।'

সন্ধ্যার আযান কানে আসতেই পূর্ণার গলা শুকিয়ে যায়। সে খপ করে মৃদুলের হাতের বাহু খামচে ধরে, কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,'আমার আর কিছু লাগবে না। জীবনে আর মেলায়ও আসব না। বাড়ি নিয়ে চলুন।'
'কাঁদতাছো কেন? আইচ্ছা আর কিছু কিনব না। বাজারে যাই। এরপরে বাড়িত যামু।'

মেলায় প্রবেশ করার পূর্বে,রায়পুরের বাজারের এক দোকানে মৃদুল তার সাইকেলটা রেখে এসেছে। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। দোকানদার মজিদ হাওলাদারের নাম শুনে,মৃদুলকে বাসায় যেতে বলেছিল। মৃদুল বলেছে,আরেকদিন যাবে। তারা মেলা থেকে বের হতে প্রস্তুত হয় তখন একজন লোক মৃদুলের পিঠ চাপড়ে বললো,'মৃদুল না?'
মৃদুল পরিচিত কারো কণ্ঠ পেয়ে উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালো। লোকটিকে দেখে চিনতে পারলো। বললো,'আরে গফুর ভাই। কেমন আছেন?'

Kobitor.com

'এইতো ভালাই আছি।'
'রায়পুরে কী? মেলায় আইছেন?'
'ছোট বইনডার জামাইর বাড়ি এইহানে। তোমার সাথে কেলা এইডে? বউ নাকি? বিয়া করলা কবে?'
পূর্ণা আড়ষ্ট হয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুল আড়চোখে পূর্ণাকে দেখলো। তারপর বললো 'জি ভাই,বউ। মাস খানেক হইলো।'

তখনই পূর্ণা মৃদুলের পিঠে চিমটি কাটলো। মৃদুল 'আউ' করে উঠে। গফুর উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তাই সে জোরপূর্বক হেসে বললো,'আজকে অনেক শীত! শীতে চিমটি মারে! আইচ্ছা,ভাই আজ আসি।'
'রায়পুর কার বাড়িত আইছো কইলা না তো?'
'অলন্দপুরে আইছি,ফুফুর বাড়িত। এহন যাই ভাই।'
'মজিদ হাওলাদার তোমার ফুফুর ভাসুর না?'
'জি।'
'মানুষটারে দেখার অনেক ইচ্ছা আছিলো। অনেক ভালা কথা হুনি।'
মৃদুলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললো,'চইলা আইয়েন। আমিতো আছিই। আমারে এখন যাইতে দেন।'
'যাও মিয়া।'

মেলার বাইরে এসে পূর্ণা বললো,'বউ বললেন কেন?'
মৃদুল বললো,'তে কী কইতাম? গ্রামে তোমারে আমারে মানুষ এক লগে কথা কইতে দেখে,হাঁটতে দেখে। এতেই নিন্দা করে। এখন যদি কেউ জানে সন্ধ্যা বেলা আমার সাথে এতো দূরে মেলায় আইছো কী হইবো জানো?'
'এইজন্য বউ বলছেন?' পূর্ণার কণ্ঠে অভিমান টের পাওয়া গেল। মৃদুল মুচকি হাসলো। বললো,'আর কী জন্যে বলব?'
পূর্ণা কিছু বললো না। শীতে তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে,এখানে অনেক বাতাস। হাঁটতে হাঁটতে মৃদুল বললো,'ভয় হইতাছে না?'
পূর্ণা অবাক হয়ে জানতে চাইলো,'কীসের ভয়?'
'পর পুরুষের সাথে রাতের বেলা এতো দূরে আছো। যদি কিছু হয়ে যায়?'
মৃদুলের কথা শুনে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায় পূর্ণা। সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মৃদুলের দিকে। মৃদুল পূর্ণার তাকানো দেখে হেসে উঠলো।
পূর্ণা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতাআমতা করে বললো,'হা...হাসছেন কেন?'
'তোমার ভয় পাওয়া দেইখা।' মৃদুল হো হো করে হাসতে থাকলো। পূর্ণার খুব রাগ হয়। সে মৃদুলকে ফেলে সামনে হাঁটতে থাকে। মৃদুল পিছনে ডাকে,'আরে খাড়াও।'

বাজারে অনেক ভীড়। চিৎকার,চেঁচামেচি। মারামারি লেগেছে বোধহয়। মৃদুল,পূর্ণা রায়পুরের ছোট বাজারের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত ভেজাল দেখে মৃদুল পূর্ণাকে বললো,'তুমি এইখানে খাড়াও। এইদিকে কেউ নাই। আমি যাইতাছি আর আইতাছি।'
পূর্ণা চারপাশ দেখলো। ঘাটে অনেক নৌকা,ট্রলার বাঁধা। কেউ নেই,সবাই বোধহয় বাজারে। মানুষ ঝগড়া করতে আর সময় পেল না! মৃদুল চলে গেল। পূর্ণা কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দূর থেকে ইঞ্জিনের শব্দ আসছে। কোনো ট্রলার এদিকেই আসছে। গা হিম করা ঠান্ডা! পূর্ণা ব্যাগ থেকে নতুন কেনা শাল বের করে গায়ে জড়িয়ে নিল। এবার ঠান্ডা কম লাগছে!

ট্রলারের ছাদে বসে আমির সিগারেট ফুঁকছে। তার এক পা ঝুলছে। শীতের তীব্রতায় আমিরের রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম। তবুও উঠে গিয়ে শীতবস্ত্র ব্যবহার করছে না। সহ্য করছে। নদীর জলে চেয়ে থেকে কিছু ভাবছে। তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। তিন-চার দিন ধরে সারাক্ষণ কপালের রগগুলো দপদপ করছে। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করেছে। খুব ঝুঁকি নিয়ে এইবার তারা মেয়ে শিকার করছে। কখন কোন ভুল হয়ে যায় কে জানে! সারাক্ষণ একটা আতঙ্ক কাজ করে। আমির যে ট্রলারে বসে আছে,সে ট্রলারটি ঘাটে বাঁধা। তাদের আরো চারটা ট্রলারও পাশে আছে। আমিরের ডানপাশে একটা ইঞ্জিনের ছোট নৌকা এসে থামলো। নৌকায় রয়েছে মজিদ,খলিল সাথে আরো দুজন লোক। তাদেরকে দেখে আমির দ্রুত সিগারেট ফেলে দিল। ছাদ থেকে নামলো। মজিদকে ভক্তির সাথে সালাম দিল। মজিদ গম্ভীরস্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন,' এইখানে কী করছো?'
আমির বাধ্য ছেলের মতো বললো,'মেলায় এসেছি। আম্মা পাঠিয়েছেন।'
'তাড়াতাড়ি ফিরো।'
'জি,আব্বা।'
মজিদের সাথে থাকা দুজন লোক মজিদের সাথে বুকে বুক মিলিয়ে বললো,'তাইলে এহন আসি ভাই?'
মজিদ বললেন,' জি,আসুন। শুক্রবার কিন্তু আসবেন।'
'আরে,আসব,আসব। আপনি দাওয়াত করবেন আর আমরা আসতাম না?'
মজিদ হেসে বললেন,'সাবধানে যাবেন।'

লোক দুটি চলে যেতেই আমির ছাদে উঠে বসে আরেকটা সিগারেট ধরাল। তীক্ষ্ণ চোখে মজিদের দিকে তাকিয়ে বললো,'সব চাপ কি আমার উপরেই? অন্যদের নাকে সরষে তেল দিয়ে আরাম করা হচ্ছে?'
মজিদ বললেন,'আরে আব্বা আমার! আমরাও তো আছি।'
খলিল বাঁকা স্বরে বললেন,'সারাবছর তো আমরাই এইহানে দৌড়াই। এই কয়দিনে তোর...'
খলিল পুরো কথা শেষ করতে পারলেন না। আমির বাঁধা দিয়ে খুব বিরক্তি নিয়ে বললো,'তুই চুপ থাক। তোর ছেড়ারে বলবি,কাল বিছানা ছাড়তে। নয়তো ওর ইঞ্জিনে এমন আঘাত করব, সামনে না বিয়ে করাতে যাচ্ছো সেই বিয়ে ভেস্তে যাবে।'
'আহ আমির! চাচাকে তুই-তুকারি করতে নিষেধ করেছি না অনেকবার? মানুষ শুনলে কী বলবে?'
'মানুষের জন্যই ওরে চাচা ডাকি। আর তোমার জন্যই ও বেঁচে আছে। নয়তো ওর দেহ এতদিনে পঁচে মাটির সাথে মিশে যেত।'

খলিলের মুখটা অপমানে থমথমে হয়ে যায়। প্রতিদিন আমিরের অপমান, দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হচ্ছে। বিন্দুমাত্র সম্মান করে না। খলিল মজিদের পাশ থেকে দূরে গিয়ে বসেন। মজিদ মুখ দিয়ে 'চ' কারান্ত শব্দ করে বললেন,'কেন যে তোরা নিজেদের মধ্যে ভেজাল করিস। এতে তো আমাদের দলই দূর্বল হয়ে যাবে।'
আমির নির্বিকার কণ্ঠে বললো,'কাউকে লাগবে না। আমি একাই যথেষ্ট।'
'বললেই তো হবে না। একা চলা যায় না।'
'আরে যাও তো।'
আমিরের মেজাজ তুঙ্গে। মজিদ সময় নিয়ে বললেন,'এতো রেগে আছিস কেন?'

Kobitor.com

আমির চোখ বড় বড় করে তাকালো। তার চোখ দুটি লাল। ভয়ংকর রেগে আছে সে। মজিদ আর কথা বাড়ালেন না। নৌকা ছেড়ে দেয়া হয়। চোখের পলকে দূরে হারিয়ে যায় নৌকাটি। ট্রলারের ভেতর থেকে মন্তু বেরিয়ে আসে। আমিরকে বলে,'ভাই,ছেড়িডারে সামলানি যায়তাছে না।'
'যেভাবে সামলানো যায়,সেভাবে সামলা। চুলের মুঠি ধরে মা-বাপ তুলে গালি দিবি। মেয়েরা ছেলেদের মুখে নোংরা গালাগাল শুনলে দূর্বল হয়ে যায়। ভয় পায়। এ কথাটা কতবার বলব?'
মন্তু ভেতরে চলে যায়। আমির সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে উড়িয়ে ঘাটের উপরের ভিটায় তাকালো। একটা বোরকা পরা মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রখর দৃষ্টি মেয়েটিকে নিশানা করে। রাফেদ বাজার থেকে রঙ চা নিয়ে আসে। আমির রাফেদকে বললো,'ঘাটের মুখে মানুষ আছে?'
'না স্যার। বাজারে এক দোকানদার আরেক দোকানদারের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তারক্তি অবস্থা। সবাই ওখানে।'
আমির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। কেউ নেই। রাফেদকে বললো,'ওইযে মেয়েটিকে দেখছো? নিয়ে আসো।'
রাফেদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল! এতো ঝুঁকি নিয়ে খোলা জায়গায় শিকার! সে ঢোক গিলে বললো,'কী বলেন স্যার! এভাবে...'
'তো? সময় আছে হাতে? এখন ঝুঁকি নিতেই হবে। পারলে,মানুষের মাঝ থেকেও তুলে আনতে হবে। মন্তুরে নিয়ে যাও। কোনোরকম বিপদ ছাড়া মেয়েটিকে নিয়ে আসবে।'
'স্যা..'
আমির জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যায়। রাফেদের কথা সে শুনলো না। তার বার বার মনে হচ্ছে,পদ্মজাকে মায়া দেখিয়ে এভাবে ছেড়ে এসে সে ভুল করে ফেলেছে। কেন ভুল মনে হচ্ছে জানে না! পদ্মজা একবার খুন করেছে এছাড়া সে খুব সাহসী,বুদ্ধিমতী। সে চাইলে বুদ্ধি দিয়েও অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু কী করবে? বের হতে তো কোনোভাবেই পারবে না। মেয়েগুলোর ঘরে ঢুকতে পারবে,কথা বলতে পারবে। এর বেশি কিছু না! তবুও মনটা কু গাইছে। ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে। সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে,'আমি কি কোনো বোকামি করে ফেললাম? ওদিকে সব ঠিক আছে তো!'

রাফেদ হা করে আমিরের যাওয়া দেখলো। তারপর একটা কাচের বোতল থেকে তরল কিছু ঢেলে নিল রুমালে। মন্তুকে নিয়ে ট্রলার থেকে নামলো। তাদের লক্ষ্য অপেক্ষারত কালো বোরকা পরা মেয়েটি।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৬৯

____
অনেক্ষণ হলো তবুও মৃদুল আসছে না। পূর্ণা বিরক্ত হয়ে নিকাব মাথার উপর তুললো। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করলো। টর্চটির আলাদা বিশেষত্ব, এটি তিন রঙের আলো দেয়। তাই মৃদুল এটি প্রান্তের জন্য কিনেছে । পূর্ণা টর্চের সুইচে চাপ দেয় কিন্তু কাজ হয় না। সে ভ্রুযুগল কুঁচকে আরো দুইবার

চাপ দিল। তাও হলো না। সুইচে আঙুল রেখে টর্চের মুখটা সে নিজের দিকে তাক করলো। মনে প্রশ্ন আসে,দোকানদার নষ্ট টর্চ দিয়ে ঠকালো নাকি?
তখনই টর্চের আলো জ্বলে উঠে। তীব্র তিন রঙের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণার চোখেমুখে। সাথে সাথে পূর্ণা চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওদিকে আমির হাতের সিগারেট নদীর জলে ফেলে পিছনে ফিরে তাকালো। রাফেদ কী করছে দেখার জন্য! রাফেদের বদলে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। তিন রঙের আলোয় পূর্ণার মুখটা স্পষ্ট। আমিরের চোখের দৃষ্টি থমকে যায়। রাফেদ,মন্তু পূর্ণার একদম কাছাকাছি চলে গিয়েছে। আমির তাৎক্ষণিক কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু রাফেদ,মন্তুকে আটকাতে তো হবেই। আমির ছাদ থেকে জোরে চেঁচিয়ে ডাকলো,'রাফেদ।'

আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে রাফেদ,মন্তু পিছনে তাকায়। পূর্ণাও তাকালো। সে আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়েছে। মৃদুল মাত্র ঘাটে প্রবেশ করেছে। তার কানেও আমিরের গলা এসেছে। চারটি চোখ হা করে আমিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমির দ্রুত ট্রলার থেকে নেমে আসে। পূর্ণা অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো,'ভাইয়া!'

আমির রাফেদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় চাপাস্বরে বললো,'ট্রলারে যাও।'
তারপর পূর্ণার দিকে এগিয়ে আসলো। বললো,'পূর্ণা এখানে কী করছো?'
মৃদুল আমিরের পিছনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমির পিছনে তাকালো। মৃদুলকে দেখতে পেল। আমির অবাক হয়ে উচ্চারণ করলো,'মৃদুল?'
তারপর আবার পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণার দৃষ্টি নত। আমির দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললো,'দুজনে একসাথে এসেছিস?'
মৃদুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো,'জি, ভাই। মেলায় আইছিলাম।'

আমির দুই পা পিছিয়ে গেল। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে পূর্ণা আর মৃদুলকে দেখলো। পূর্ণা আতঙ্কে বার বার মৃদুলের দিকে তাকাচ্ছে। মৃদুল ইশারায় তাকে ভরসা করতে বলছে। আমিরের কেন জানি হাসি পাচ্ছে। কিন্তু চোখেমুখে গাম্ভীর্য রেখে বললো,'একদম ঠিক করোনি পূর্ণা। এভাবে রাতের বেলা এত দূরে চলে এসেছো। আবার অজানা,অচেনা একজন ছেলের সাথে।'
আমিরের কথা শুনে মৃদুল আহত হয়। পূর্ণার বুক ধুকপুক, ধুকপুক করছে। আমির যেহেতু জেনেছে পদ্মজাও জানবে। আর তারপর কী হবে, পূর্ণা ভাবতে পারছে না। মৃদুল পূর্ণার অবস্থা বুঝতে পেরে আমিরকে বললো,' ভাই,ও আসতে চায় নাই। আমি জোর করছিলাম...'
আমির মৃদুলকে বাঁধা দিয়ে বললো,"পূর্ণাকে তোর চেয়ে আমি বেশি ভালো চিনি। নিজের ইচ্ছায় এসেছে নাকি কারো কথায় সেটা বুঝতে পারছি।'

ভয়ে,লজ্জায় পূর্ণার মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আমির গাম্ভীর্যতার সাথে রাগ মিশিয়ে বললো,'এর একটা বিহিত করতেই হবে। নালিশ বসাব আমি।'
'ভাই...'
'তুই থাম মৃদুল! পূর্ণা আমার বোন। আমার বোন নিয়ে আমি কী করব সেটা আমার ব্যপার।'

আমিরের প্রতিটি কথায় পূর্ণা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে ভয়ে ভ্যাঁ,ভ্যাঁ করে কান্না করে দিল। মৃদুলের সাথে আমিরও থতমত খেয়ে গেল। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বললো,'আমি আর আসবো না ভাইয়া।'

Kobitor.com

পূর্ণার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখে আমির সশব্দে হেসে উঠলো। পেট চেপে ধরে হাসতে থাকলো। কতদিন পর এভাবে মন খুলে হেসেছে কে জানে! আমিরের হাসি দেখে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। মৃদুল শুধু অবাক হয়ে দেখছেই। প্রথম পূর্ণা হুট করে কান্না শুরু করে দিল,এখন আমির হুট করে পাগলের মতো হাসছে! হাসতে হাসতে আমিরের চোখে জল চলে আসে। সে অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললো,'কাঁদতে হবে না। আমি কিছুই করব না। প্রেম করা যায় আর ধরা পড়লেই কাঁপাকাঁপি?'
পূর্ণা আড়চোখে মৃদুলকে দেখে মিনমিনিয়ে বললো,'আমাদের মধ্যে প্রেমট্রেম নেই ভাইয়া।'
আমিরের মুখটা হা হয়ে গেল। সে বিস্ময় নিয়ে বললো,'সেকী! কী যুগ আসলো! প্রেম,ভালোবাসা ছাড়াই ছেলেমেয়ে একসাথে রাতের বেলা মেলায় চলে এসেছে।'
মৃদুল বললো,'বন্ধু...বন্ধু হই।'
আমির ভ্রু উঁচিয়ে বললো,'তাই না? তোরা বন্ধু? আচ্ছা,হতেই পারে বন্ধুত্ব। শোন, পদ্মজা পূর্ণার বিয়ে ঠিক করেছে। মৃদুল,তুই কিন্তু পূর্ণার বিয়েতে আমার সাথে নাচবি।'
মৃদুলের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠে। পূর্ণা চকিতে তাকাল। গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো,' কবে? কোথায় ঠিক করেছে?'
'সে আমি কী বলব? তোমার বোন জানে।'
পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। সে মৃদুলকে এক নজর দেখে আমিরকে প্রশ্ন করলো,'তোমরা ঢাকা থেকে কবে আসছো?'
আমির প্রশ্নটা শুনে তখনই জবাব দিল না। ভাবলো,পূর্ণা বোধহয় পদ্মজার খোঁজে তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। আর তখন বাড়ির কেউ হয়তো বলেছে ঢাকার কথা। আমির হেসে জবাব দিল,'বিকেলে। কাল যেও বাড়িতে। বোনের সাথে দেখা করে আসবে।'

পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। আমির খেয়াল করলো,মৃদুল,পূর্ণা দুজনের মুখে কালো ছায়া নেমে এসেছে। তাই সে মিথ্যের পর্দা সরিয়ে বললো,'বিয়ে ঠিক করেনি। মজা করেছি। তারপর মেলা থেকে কী কী কেনা হয়েছে?'
আমিরের কথা শুনে মৃদুল-পূর্ণার বুকে এক পশলা বৃষ্টি নেমে আসে। বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে বললো,'অনেক কিছু কেনা হয়েছে। সব উনি কিনে দিয়েছেন।'
'তাই নাকি! আমি কিছু কিনে দেব না? মৃদুল,মেলা ভেঙে গেছে?'
'না ভাই,ভেঙে যাবে।'
'তাহলে চল,যাই।'
পূর্ণা আটকাল,'না ভাইয়া,আর কিছু লাগবে না। অনেক কিছু হয়ে গেছে।'
'এসব তো বন্ধু দিয়েছে। ভাইয়ের উপহার আলাদা। নাকি এখন শুধু পূর্ণা বন্ধুর উপহারই নিবে। বাকি সব বাদ!'
আমিরের মশকরা বুঝতে পেরে পূর্ণা বললো,'ধুর,ভাইয়া।'
আমির হাসলো। বললো,'কোনো কথা না। আমরা এখন মেলায় যাব। মৃদুল তোর সাইকেলটা ওইযে ছোট ট্রলারটা ওখানে রেখে আয়। পূর্ণার হাতের ব্যাগটাও নিয়ে যা। যাওয়ার সময় ট্রলার দিয়ে চলে যাবি। রাতের বেলা হাওড়ের ক্ষেত দিয়ে না যাওয়াই ভালো। সাথে যখন পূর্ণা আছে।'
'তুমি ফিরবে না ভাইয়া?' বললো পূর্ণা।
আমির বললো,'একটু দেরি হবে। একজনের সাথে দেখা করতে এসেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে। মৃদুল যা।'

মৃদুল সাইকেল আর ব্যাগ রেখে আসে। তারপর তিন জন একসাথে মেলায় প্রবেশ করে। পূর্ণার শাড়ি বেশি পছন্দ। তাই আমির শাড়ি কিনলো বেশি। একটা শাড়িতে তার চোখ আটকে যায়। কালো রঙের রেশমি সুতার শাড়িটা চোখে পড়তেই পদ্মজার মুখটা ভেসে উঠে। পদ্মজার কালো রঙ ভীষণ পছন্দের। ফর্সা,ছিমছাম আদুরে শরীরে যখন কালো রঙের শাড়ি লেপ্টে থাকে কী অপূর্বই না দেখায়! আমিরের তো মাঝে মাঝে মনে হয়,কালো রঙের সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র পদ্মজার রূপের ঝলকানি বুঝাতে! চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পদ্মজার ঠোঁটের নিচের সূক্ষ্ম স্থির কালো তিলটা। হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তিলটা থেকেও যেন অদ্ভুত কোনো আলো বের হচ্ছে! আমির মুচকি হেসে শাড়িটা কিনে নিল। আর কিছু কিনলো না। পদ্মজা গয়নাগাটি পছন্দ করে না। তারপর চলে এলো ঘাটে। পূর্ণা খুশিতে আটখানা। এত কিছু পেয়েছে আজ! ট্রলারে করে চলে গেল মৃদুল-পূর্ণা। সাথে গেল মন্ত্ত। মন্তু পূর্ণাকে বাড়িতে অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। আমির তার আগের জায়গায় এসে বসে। মৃদুল-পূর্ণার ব্যাপারটা অদ্ভুত শান্তি নিয়ে এসেছে বুকে! কত সুন্দর তাদের জীবন। কোনো জটিলতা নেই,কোনো দূরত্ব নেই!

আমিরের মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, সে তো কথায় কথায় পূর্ণাকে আগামীকাল তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে! কিন্তু পদ্মজা তো সেখানে নেই! তাছাড়া বেশ কিছুক্ষণ আগেও সে পদ্মজার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। একটু ওদিকে যাওয়া দরকার। আমির রাফেদকে ডেকে বললো,'আমি ফিরছি। মন্তু এখুনি চলে আসবে। যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল মনে রাখবে। দুজন চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করবে। চাচাও আসবে বোধহয়। একটু দেরি হলেও, আমি আসবই।'
'জি,স্যার।'

____

পদ্মজা ভেবেছিল আরভিদ তার উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু করেনি। পদ্মজা বিওয়ান(B1) ঘরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দরজায় তালা দেয়া। ভেতরেও কোনো সাড়াশব্দ নেই! মেয়েগুলো বেঁচে আছে তো? যে ঘরে পাচার করার উদ্দেশ্যে কতগুলো মেয়েকে বেঁধে রাখা হয়েছে সে ঘরের দরজাটা আবার খোলা। দরজার উপর লেখা বিথ্রি(B3)। পদ্মজা বিথ্রির সামনে সন্ধ্যা অবধি ঘুরঘুর করেছে। প্রবেশ করার সাহস হয়নি। তার হাত বন্দি,আবার আরভিদ সবসময় তার উপর চোখ রাখছে। কখন না ইজ্জতে হাত দিয়ে দেয়। সে ভয়ে পদ্মজা এগোয়নি। সন্ধ্যায় রিদওয়ানের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বের হচ্ছিল। পদ্মজাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে, সে অবাক হয়েছিল।
আরভিদকে জিজ্ঞাসা করে,'কী ব্যপার?'
আরভিদ বললো,'স্যার যা বলেছেন,তাই হচ্ছে।'
রিদওয়ান পদ্মজার দিকে চোখ রেখে বললো,'আমির এই মেয়ের রূপে ডুবে আছে। কবে যে ঘোর কাটবে! দেখে রেখো। কখন কী করে বসে!'
রিদওয়ান দরজা খুলতে চেষ্টা করলো। খুলল না। আরভিদ বললো,' চাবি স্যারের কাছে।'
রিদওয়ানের খুব বিরক্তি নিয়ে বললো,'ধ্যাত!'

তারপর চলে এলো বিটুতে। শরীরে অনেক ক্লান্তি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।।ঘুম আসছে না। কিছুক্ষণ আগেই খাবার খেয়েছে। আজকের রাতটা এক ঘুমে কাটাতে পারলে শরীরটা প্রায় সুস্থ হয়ে যেত। রিদওয়ান অনেক ভেবেচিন্তে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর শুয়ে পড়লো। বেশিক্ষণ লাগেনি ঘুমাতে। পদ্মজা রিদওয়ানকে দূর থেকে দেখেছে। কথা বলতে আসেনি। সন্ধ্যার পর হতাশ হয়ে নিজ ঘরে চলে আসে। ঘরে অনেকক্ষণ পায়চারি করে। শুয়ে থাকে। এশারের দিকে আবার বেরিয়ে আসে। ভালো লাগছে না কিছু। স্বাগতম ও ধ-রক্ত দরজার মধ্যখানে থাকা

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

সোফায় আরভিদ ঘুমাচ্ছে! আরভিদকে ঘুমাতে দেখে পদ্মজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। পা টিপে,টিপে সাবধানে ধ-রক্তে প্রবেশ করে। তারপর দ্রুত হেঁটে বিথ্রিতে চলে আসে। মেঝেতে পড়ে আছে অনেকগুলো মেয়ে। তাদের হাত,পা,মুখ বাঁধা। দুই-তিন জন ঘুমাচ্ছে। বাকিরা পদ্মজার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে গেল। চাপা স্বরে বললো,'আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। ভয় পেও না।'

সবার সামনে একটা স্বাস্থ্যবান মেয়ে বসেছিল। পদ্মজা মেয়েটির পিছনে গিয়ে বসলো। মেয়েটির মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। পদ্মজার হাত পিছন থেকে হ্যান্ডকাপ পরানো। তাই সে কাপড়ের গিট্টুটি নিজের দাঁত দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো। খুব দ্রুতই সে সফল হয়। প্রতিটি মেয়ে অবাক হয়ে পদ্মজাকে দেখছে। অসম্ভব সুন্দর পদ্মজার উপর থেকে তারা চোখ সরাতে পারছে না। মনে হচ্ছে,বিধাতা কোনো দূত পাঠিয়েছেন। আসার পথে গালে ব্যথা পেয়েছে! স্বাস্থ্যবান মেয়েটির মুখ মুক্ত হতেই পদ্মজাকে বললো,'আপনি কেলা?'
পদ্মজা ভয়ার্ত চোখে দরজার দিকে তাকালো। তারপর ফিসফিসিয়ে বললো,'আমি পদ্মজা। চিনবে না আমাকে। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।'

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা স্বাস্থ্যবান মেয়েটির হাতের বাধঁন খোলার জন্য তার পিছনে গিয়ে পিঠ করে বসলো। হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করলো,পারলো না। হ্যান্ডকাপের মাঝের দূরত্ব খুব কম। পদ্মজা শুধু আঙুল নাড়াতে পারছে। তাই দাঁত দিয়ে দঁড়ির গিট্টু খোলার জন্য সে শুয়ে পড়লো। গালের ক্ষতস্থানে ঠান্ডা মেঝে লাগতেই শিরশির করে উঠে। যে দঁড়ি দিয়ে মেয়েটির হাত বাঁধা হয়েছে সে দঁড়িতে অনেক ময়লা ছিল। পদ্মজার মুখের ভেতর ময়লা প্রবেশ করে। পদ্মজার কষ্ট হয় তবুও সে থামেনি। ঠিক নয় মিনিট পর মেয়েটি হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়। খুশিতে মেয়েটির বুকে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। নিজের হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে। পদ্মজা অনুরোধ স্বরে বলে,'এবার তুমি বাকিদের মুক্ত করো।'

মেয়েটি তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ায়। আরো দুটো মেয়েকে বাঁধন থেকে মুক্ত করে। তারপর তিনজন মিলে বাকিদের সাহায্য করে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। পদ্মজা সবাইকে কথা বলতে নিষেধ করেছে। সে মনে মনে প্রার্থনা করছে, কেউ যেন না আসে। আর তারা সবাই যেন বেরিয়ে যেতে পারে। আমিরের বোকামি,সে পদ্মজাকে ছেড়ে গিয়েছে। এই বোকামি আর কখনো আমির করবে না। আজ কাজে না লাগাতে পারলে সব শেষ! মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজনায় কাঁপছে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে বললো,'সামনে একজন লোক বসে আছে। সে ঘুমে আছে। যদি সজাগ হয়ে যায়, সবাই আক্রমণ করবে। ভয় পাবে না।।নিজেদের ইজ্জতের উপরে কিছু নেই। ইজ্জত রক্ষার জন্য কাউকে আঘাত করার সাহস বুকে রাখতে হয়। একদম ভয় পাবে না। লড়াই করবে। এইযে তুমি আর তুমি আমার সাথে একটু আসো। বাকিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

দুটো মেয়ে পদ্মজার সাথে সাথে যায়। পদ্মজা বিফাইভে চলে আসে। বিকেলে যখন এদিকে হাঁটছিল এই ঘরের এক কোণে সে লাঠি আর পাথর দেখেছিল। মেয়ে দুজনকে বললো,'লাঠিগুলো নাও,আর পাথর তিনটাই নিয়ে নাও।'

তিনজন আবার বিথ্রিতে চলে আসে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে বললো,' কাদের সাহস বেশি? কাউকে আঘাত করার মতো সাহস কার কার আছে?'

ছয়টা মেয়ে হাত তুলে। তারা হাতে লাঠি আর পাথর তুলে নেয়। পদ্মজা বলে,'যখনই আক্রমণ করতে বলবো,আক্রমণ করবে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে যেভাবে পারো আঘাত করবে। যদি তোমরা না পারো,তবে বিদেশ পাচার হয়ে যাবে। সেখানে তোমাদের অনেক খারাপ কাজ করতে হবে। যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা দাঁত আর নখ কাজে লাগাবে।'

মেয়েগুলো বাধ্যর মতো মাথা নাড়ায়। তারা ঘোরের মধ্যে আছে। প্রাণের মায়া চলে গিয়েছিল। পদ্মজার হঠাৎ আগমনে মনে বাঁচার আশা জেগেছে। সবাই সাবধানে বিপ্রি থেকে বেরিয়ে আসে। সামনে পদ্মজা। ধ-রক্ত দরজা পেরোবার সময় মেয়েগুলো ধাক্কাধাক্কি করে। ধাক্কা খেয়ে একটা মেয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। আর্তনাদ করে উঠে। আরভিদ চোখ খুলে সামনে এতগুলো মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে যায়। সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না! পদ্মজা উঁচুকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে,'সবাই এই লোকটাকে আক্রমণ করো।'

স্বাস্থ্যবান মেয়েটি সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি দিয়ে আরভিদের পিঠে আঘাত করে। আরভিদ পড়ে যায়। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরভিদ মেয়েগুলোকে ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পনেরোটা যুবতী মেয়ে তো কম কথা নয়! সে কিছুতেই পেরে উঠেনি। মার খেতে খেতে উঁবু হয়ে যায়। যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা লাথি দিতে থাকে অনবরত। একটা মেয়ে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা তাকে উৎসাহ দিতে জোরে বললো,'লোকটার মাথায় আঘাত করো। দ্রুত করো। চাইলে সব পারা যায়। তুমি ভয় পেও না।'

মেয়েটি পদ্মজার কথামতো বড়সড় পাথরটি দিয়ে আরভিদের মাথায় আঘাত করে। আরভিদের মরণ আর্তনাদ আর মেয়েগুলির ক্রোধ মেশানো নিঃশ্বাসে চারপাশ কেঁপে উঠে। পদ্মজার সত্তা বিজয়ের আগমনে হেসে উঠে। রক্তাক্ত আরভিদ নিস্তেজ হয়ে যায়। মেয়েগুলো থামে,হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা দরজার সামনে এসে চাবি খুঁজতে থাকে। চাবি নেই! দ্রুত আরভিদের কাছে আসে। তার প্যান্ট আর শার্টের পকেটে চাবি খুঁজে। নেই! পদ্মজার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর এক ধাপের জন্য তারা আবার আটকে যাবে! পদ্মজা দুটো মেয়েকে নিয়ে পুরো পাতালঘর তন্ন,তন্ন করে চাবি খুঁজে। যেসব চাবি পেয়েছে একটাতেও দরজা খোলা যায়নি। মেয়েগুলোর মধ্যে যে আনন্দ এসেছিল তা হারিয়ে যায়। পদ্মজাও ভেঙে পড়ে। সে মেয়েগুলোকে আশ্বাস দেয়,'কিছু হবে না। আমরা পারব।'

দরজায় সবাই মিলে ধাক্কাধাক্কি করে,তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। এই দরজা কী ধাক্কা দিয়ে ভাঙার মতো! পদ্মজা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো,'শুনো সবাই,আমরা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকব। যখনই কেউ দরজা খুলবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এই লোকটার মতো অবস্থা করে সবাই পালাব। এখন যেভাবে সবাই একসাথে কাজ করেছো তখনও করবে। ঠিক আছে?' মেয়েগুলো মাথা নাড়াল। তারা প্রস্তুত। দশ মিনিট...বিশ মিনিট...ত্রিশ মিনিট পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সবার হৃদস্পন্দন থেমে যায়। পদ্মজার সবার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আক্রমণ করতে বলে। দরজা খুলতেই সবগুলো মেয়ে হইহই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খলিল দুই হাতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আমির পিছনে ছিল। সে এসে দেখে বাইরে খলিল,মজিদ দাঁড়িয়ে আছে। চাবি তাদের কাছে নেই। আমির খলিলের হাতে চাবি দেয়। খলিল দরজা খুলতেই এতগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃশ্যটি দেখে আমিরের চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। উত্তেজিত হয়ে মজিদকে বললো,'আব্বা সামনের দরজা বন্ধ করো।'

kobitor.com

মজিদ সামনের দরজা বন্ধ করতে চলে যান। আমির এগিয়ে আসে। দীর্ঘদেহী,তুষ্টপুষ্ট আমির দুই হাতে মেয়েগুলোকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দুজন মেয়ে লাঠি দিয়ে আমিরকে আঘাত করতে চায়,আমির দুই হাতে দুটো লাঠি ধরে ফেলে। লাঠিসহ মেয়ে দুটোকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। বাকি মেয়েগুলোকে চোখের পলকে চড়-থাপ্পড় দিতে শুরু করে। তার চোখ দুটি থেকে রাগ,ক্রোধ-আক্রোশ ঝরছে। একটা মেয়ে আমিরের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরটি আমিরের ঘাড়ে পড়ে। রিদওয়ান ঘাড়ে আঘাত করার বোধহয় তিন সপ্তাহও কাটেনি। আবার পাথরের আঘাত পেয়ে ঘাড়ের কালো আস্তরণ সরে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। পদ্মজার জন্য কেনা শাড়িটা আমির গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। আসার পথে ট্রলারের ছাদে বসে শাড়িটা দেখছিল,শাড়ির ব্যাগ পাশে রেখেছিল। কখন যে ব্যাগটি উড়ে যায়,টের পায়নি আমির। যখন টের পেল কিছু করার ছিল না। তাই গলায় মাফলারের মতো পেঁচিয়ে রেখে দেয়। তার পদ্মবতীই তো পরবে! আমিরের রক্তে শাড়িটি ভিজে যায়। সে ঝড়ের গতিতে ঘূর্ণিপাকের মতো প্রতি মেয়েকে আঘাত করে দূর্বল করে দেয়। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। আমির তার রক্তচক্ষু দিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজার হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠে। সে কিছু বুঝে উঠার পূর্বে,আমির পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে। শাড়িটি দিয়ে পদ্মজার গলা পেঁচিয়ে জোরে টেনে ধরে। তারপর কিড়মিড় করে বলে,'ছলনাময়ী!'

আমিরের নিঃশ্বাস থেকে যেন বিষ বের হচ্ছে। আজরাইলের রূপ ধারণ করেছে। পদ্মজার দুই হাত বন্দি। নিজেকে রক্ষার কোনো পথ নেই। সে ছটফট করতে থাকে। একবার আমিরের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার পূর্বেই চোখ দুটি উলটো হয়ে আসে। বুকে ব্যথা শুরু হয়। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস আটকে যায়। মৃত্যু তার খুব কাছে। আর একটু সময়...পদ্মজা কালিমা পড়ার চেষ্টা করে। মৃত্যুর আগে সে কালিমা পড়ে যেতে চায়। অস্ফুটভাবে তার মুখে 'ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ হয়। আমিরের কানে শব্দটি আসতেই তার হাত দুটি কেঁপে উঠে। ছেড়ে দেয় পদ্মজার গলা। পদ্মজা লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। চোখ আধবোজা! ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। হাঁপড়ের মতো বুক ওঠানামা করছে। কষ্টে পুরো শরীর মুচড়ে যাচ্ছে! গলা নীল হয়ে গেছে!

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭০

____

পাতালপুরী নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বিথ্রিতে মেয়েগুলো বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। পদ্মজা এওয়ানের পালঙ্কে শুয়ে আছে। তার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। ঘরের ছাদে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটি শুষ্ক। এক ফোঁটাও পানি নেই। নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে সে। বিটুর দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে আমির। তার চাহনি এলোমেলো। মস্তিষ্ক অন্যমনস্ক। এক টুকরো ছোট পাথর কামড়াচ্ছে। পাথরটা দিয়ে নিজের দাঁতে আঘাত করছে। মজিদ তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ যাবৎ আমিরকে পরখ করছেন। তিনি আমিরের হাব-ভাব বুঝার চেষ্টা করছেন। আমিরের দুই হাত অনেকক্ষণ ধরে কাঁপছে। এমনকি তার শরীরও কাঁপছে। মজিদ বিস্মিত! আমির দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সেজদার মতো উঁবু হয়। আর্তনাদের মতো শব্দ করে

মুখে। দুই হাতে মেঝে খামচে ধরার চেষ্টা করে। খলিল কিছু বলতে চাইলে মজিদ আটকে বললেন,'এখন কোনো শব্দ করা ঠিক হবে না। ওর মাথা ঠিক নেই।'

আমির সোজা হয়ে বসে। তার চোখ দুটি রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে। মেঝেতে শুয়ে, দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরে। কিছু একটা ভাবছে সে। দেখে মনে হচ্ছে,সমুদ্রের অতলে সে হারিয়ে যাচ্ছে। পানি খেতে খেতে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কোনদিকে সাঁতরালে কিনারা পাওয়া যাবে ঠাওর করতে পারছে না। মজিদ খলিলকে নিয়ে সরে যান। আমির উঠে দাঁড়ায়। ঘরে পায়চারি করে। ঘন,ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ে। ঘাড়ের রক্ত শুকিয়ে গেঞ্জির সাথে লেপ্টে আছে। আমির চেয়ারে বসে হেলান দিলো। চোখ বুজতেই ভেসে উঠে পুরনো মুহূর্ত। আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা। তার মাঝে ছিল একটা মাত্র চাঁদ। আকাশের নিচে পদ্ম নীড়ের ছাদে আমির পদ্মজাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃদু কোমল বাতাসকে স্বাক্ষী রেখে পদ্মজা বলেছিল,'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বামীটি আমার, তাই প্রতিটি মেয়ের আমাকে হিংসে করা উচিত।'

আমির দ্রুত চোখ খুলে ফেলে। তার শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। অস্থির,অস্থির লাগছে। বোতল থেকে পানি বের করে খেল।
তারপর বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। এক কোণে পরে থাকা শাড়িটা হাতে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। যতক্ষণ না পুরো শাড়িটা ছাই হয়েছে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ঠোঁট অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। সে কী কাঁদতে চাইছে?

মজিদ হাওলাদার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন। খলিল বললো,'আমিরের হাব-ভাব তো ভালা না ভাই। আলমগীরের মতো না কাম কইরালায়।'
মজিদ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,'এরকম হবে না। আমির কখনো নিজের তৈরি করা সাম্রাজ্য ছাড়বে না। তুই বের হয়ে যা। মন্তুরা বসে আছে।'
'তুমি এইহানে থাকবা?'
'আর কেউ আছে এখানে? মেয়েগুলোকে তো বারেকের সাহায্য নিয়ে সামলাতে পেরেছি। এখন ওরে বাইরের পাহারা বাদ দিয়ে ভেতরে আসতে বলবো?'
'রাগো কেন? আমি তাইলে যাইতাছি।'
'কাঞ্চনপুরের চেয়ারম্যানরে বলে আসবি শুক্রবারের কথা। কোনো ভুল যাতে না হয়।'
'আচ্ছা ভাই।'
খলিল বেরিয়ে যায়। মজিদ ধোঁয়া উড়ান। পুরো ঘরে সেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে।

আমির এওয়ান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। স্বাভাবিক হতে তার মাঝরাত অবধি সময় লেগে গেছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো পদ্মজাকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে। আমির দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। পদ্মজা দরজা খোলার শব্দ শুনেও ফিরে তাকালো না। আমির কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করলো,তার কথা আসছে না। গলা বসে গেছে। সে পদ্মজার পায়ের কাছে গিয়ে বসলো। আমির পদ্মজার পায়ে হাত দিল,পদ্মজা পা সরিয়ে নেয়নি। আমির বেশখানিক মুহূর্ত বসে থাকে সেখানে। তারপর বললো,'সকালে আমরা অন্দরমহলে যাবো।' পদ্মজা জবাব দিল না। আমিরের এখানে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যতক্ষণ এখানে থাকবে,পদ্মজা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। তাই বেরিয়ে যেতে উঠে দাঁড়াল। দরজার বাইরে পা রাখতেই পদ্মজার শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,'এই শক্তি আর মেধা ভালো কাজে লাগালে এর চেয়েও বড় রাজত্ব পেতেন। বেহেশত পেতেন। পরিবার পেতেন।'

Kobitor.com

আমির শুনেও না শোনার ভান করে দরজা ছেড়ে, এওয়ানের বাইরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। সেখানে উপস্থিত হলেন মজিদ। আমিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,'বাবু এদিকে আয়।' আমির,মজিদ একসাথে সোফায় এসে বসে। আমির ক্লান্ত। ক্লান্তি তার চোখেমুখে। মজিদ বললেন,'দুইদিন পর শুক্রবার। মনে আছে তো?'

আমির মনে করার চেষ্টা করলো। শীতে তারা শীতবস্ত্র বিতরণ করে। এ নিয়ে বড় সমাবেশ হয়। কত,কত গ্রাম থেকে মানুষ আসে। দুনিয়ার লোক দেখানো পাপ-পুণ্যের হিসাবের খাতায় হাওলাদার বাড়ির নাম পূণ্যের খাতায় সবার উপরে! আমির নির্বিকার স্বরে বললো,'মনে আছে।'
'দেখিস,পদ্মজা যেন কোনো ভেজাল না করে।'
'আর কী ভেজাল করবে? মেরেই ফেলেছিলাম আরেকটু হলে। মেরে ফেললে খুশি হবে?' আমির আচমকা রেগে যায়। মজিদ মৃদু হেসে বললেন,'মারবি কেন? তোর বউ তোর কাছে রাখবি। শুধু একটু খেয়াল রাখতে বলেছি।'
'কিছু করবে না ও। আমি দ্বিতীয়বার আর ভুল করব না।' আমির বিরক্তি নিয়ে বললো।
'না হলেই ভালো। কুয়েতে সময় চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছি।'
'সময় দিবে না। আর এতো অনুরোধ করার কী আছে? সময়মত হয়ে যাবে। তুমি এখন সামনের কাজে মন দেও। আমি এই ব্যাপারটা দেখছি।'
মজিদ আমিরের পিঠ চাপড়ে বললেন,'বাঘের বাচ্চা!'
আমির পূর্বের স্বরেই বললো,' যাওয়ার সময় বারেক ভাইকে বলো আসতে।'
'বাইরে কে থাকবে? তুই এখন থাক এখানে।'
আমির কিছু বললো না।

চারপাশ থমকে আছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমির নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে। চুপ করে বসে আছে। ঘাড়ের ব্যথাটা বেড়েছে। জ্বালাপোড়া করছে। সে দুই তিন বার এওয়ানের দরজার দিকে তাকিয়েছে। হাজারবার নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়েছে। কেন এমন হচ্ছে সে জানে না! তার একপাশে যেন রক্ত,অন্যপাশে ফুলের বাগান। ফুলের সুবাস তাকে চম্বুকের মতো টানছে। অন্যদিকে রক্তের রঙ যে তার পেশা,রীতি, নেশা,দায়িত্ব। আমির ঠোঁট কামড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। দ্রুত পায়ে চলে আসে এওয়ানে। ঘরে আবছা আলো। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে। তার হাতে হ্যান্ডকাপ রয়ে গেছে। আমির জুতা খুলে হেঁটে আসে। নয়তো শব্দ শুনে উঠে যাবে পদ্মজা। সে টের পায় তার দুই পা কাঁপছে! প্রবল জড়তা কাজ করছে। তাদের আলাদা দুই পথ এক হতে চাইছে না। একজন মানুষ হয়ে দুই সত্তা নিয়ে বাঁচা যায় না। দুই সত্তা বড় যন্ত্রণার। আমির পদ্মজার পায়ের কাছে বসলো। ফর্সা দুটি পা স্থির হয়ে আছে। আমিরের লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ছুঁলো না। পদ্মজার মুখের দিকে চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। পৃথিবীর একমাত্র অদ্ভুত মানুষটি বুঝি সে। আমির বিছানায় উঠে বসে। পদ্মজার গলার দাগটা দেখার চেষ্টা করে। পদ্মজা জেগে উঠে। আমিরের মুখটা ঝুঁকে আছে তার উপর। সে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই আমির পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে। পদ্মজার বুকে মাথা রেখে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখে। শুনতে পায়,পদ্মজার বুকের ধুকধুকানি। পদ্মজা চমকে যায়।

পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। পদ্মজা ঢোক গিলে বললো,'আপনার রাজত্বে এসে আপনার সাথে পেরে উঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু তো বলতেই পারি,আপনার ছোঁয়া আমার কাছে সবচেয়ে নোংরা,অপবিত্র।'

আমির জবাবে কিছু বলল না। চুপচাপ সরে গেল। অন্যদিকে ফিরে শুয়ে রইলো। পদ্মজা আমিরের পিঠের দিকে তাকায়। বুকটা হাহাকার করে উঠে। এতক্ষণ তো সে শক্তই ছিল। আমিরের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আসেনি,মায়া আসেনি। এখন কেন এমন হচ্ছে! আমিরের সাথে সাথে নিজের প্রতিও ঘৃণা চলে আসে। হাজার মেয়ের জীবন নষ্ট করা মানুষটাকে সে এখনো ভালোবাসে! তার মন কাঁদে। পদ্মজা ছাদের মেঝেতে তাকিয়ে মনে মনে হেমলতাকে বললো,' তোমার মেয়ে এতো খারাপ মানুষ কী করে হলো আম্মা? আমি পাপীকে ভালোবেসে পাপ করছি! ক্ষমা করে দিও আমাকে। ক্ষমা করতে না পারলে,অভিশাপে পুড়িয়ে ছাই করে দাও আমাকে।'

যাদের ভালোবাসাকে বাজি ধরতে হয়,ভালোবাসাকে রক্তারক্তির যুদ্ধে নামাতে হয়,বুকের ভেতর ভালোবাসাকে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখা যায় না তারা বোধহয় সবচেয়ে বেশি অসহায়। পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সে ভেজাকণ্ঠে বললো,'যেদিন আপনার মনে হবে,আপনার দ্বারা আর কারো ক্ষতি হবে না। পাপ হবে না। সেদিন আমাকে পদ্মবতী ডেকে জড়িয়ে ধরবেন।' আমির নিশ্চুপ রইলো। কিছু বলার মতো ভাষা তার মস্তিষ্কে নেই। সে নির্বাক। পৃথিবীতে তিনটা মানুষকে সে ভালোবেসেছে। তার থেকে দুটো মানুষই তার পাপের জন্য তার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আরেকজন চলে যাওয়ার পথে। তারপরও আমির পারে না সবকিছু ছেড়েছুড়ে দূরে হারিয়ে যেতে। তার ইচ্ছে করে না,সে ভাবতে পারে না। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বললো,'আমার মা নেই,বাবা নেই। আমার স্বপ্ন,আশা,সবকিছুই তো আপনি ছিলেন। আপনাকে নিয়ে আমি বৃদ্ধ হতে চেয়েছি। সেই আপনি আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। শত,শত মেয়েকে পিটিয়ে জান ছিনিয়ে নেন। আল্লাহর দোহাই লাগে,আমার কষ্টটা অনুভব করুন। আমি হাশরের ময়দানে কী করে মুখ দেখাব? মৃত,অত্যাচারিত মেয়েগুলোর সামনে কী করে দাঁড়াব? হাশরের ময়দানে সবাই আমার দিকে ঘৃণ্য চোখে চেয়ে থাকবে। কলঙ্কিনী আমি। আপনার বউ হয়ে আমি কলঙ্কিনী হয়েছি। মেয়েগুলোর বাবা,মাকে আমি কী বলব? তাদের নারীছেঁড়া ধনকে ছিনিয়ে নেয়া পুরুষটিকে আমি ভালোবেসেছি এই কথা কী করে বলব? বলতে পারেন?'

আমির উঠে বসে। বেরিয়ে যায়। পদ্মজা কাঁদতে থাকলো। চোখের জল শুকায় না। আল্লাহ তায়ালা এ কোন পরীক্ষায় ফেলেছেন! আমির খুব দ্রুত ফিরে আসে। তার হাতে লম্বা একখানা বস্তু। সে সেই বস্তুটি বিছানার উপর রেখে প্যান্ট থেকে চাবি বের করলো। হ্যান্ডকাপ খুলে পদ্মজাকে বসিয়ে দিল। তারপর পদ্মজার সামনে বস্তুটি ধরে শান্তস্বরে বললো,' আমি পারবো না সরে আসতে। এই তলোয়ার ব্যবহার করা হয়নি। খুব পছন্দ করে এনেছিলাম। তোমার হাতে তুলে দিলাম। যদি পারো,মুক্তি দিও আমাকে। কোনো কলঙ্ক রেখো না গায়ে। হাশরের ময়দানেও তুমি সবচেয়ে সুন্দর,সম্মানিত এবং দামী থাকবে। শুধু বেহেশতে দুজনের একসাথে রাজপ্রাসাদে থাকার স্বপ্নটা পূরণ হবে না।'

আমিরের বলা কথাগুলো শুনে পদ্মজার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। বুকে ব্যথা শুরু হয়। আমির পদ্মজার দুই হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু দিল। তারপর বললো,'শেষবার ছুঁয়েছি আর ছুঁবো না। শপথ করছি, আর ছুঁবো না।'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

তারপর ছুটে যায় বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। পদ্মজা দম বন্ধ হয়ে আসে।
মিনিট দুয়েক পার হতেই চাদর খামচে ধরে হাউমাউ করে কান্না শুরু করে। আল্লাহ উপর প্রশ্ন তুললো,'আমার ভালোবাসায় কী কমতি ছিল আল্লাহ? কেন এমন জীবন দিলে আমায়! আমি কী করব? মৃত্যু দাও আমাকে।'

পদ্মজা চোখভর্তি জল নিয়ে তুষারের দিকে তাকালো। তুষার এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে,'মাই গড!'
তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে যায়। চোখে জল চিকচিক করছে। এমন অদ্ভুত ভালোবাসা সে দুটো দেখেনি। একজন খুন হতে চেয়েছে,আরেকজন খুন করে মুক্তি দিয়েছে। ফাহিমা কাঁদছে। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে বললো,'আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন?'
'আমির হাওলাদারের একটা সুন্দর জীবন হতে পারতো।' আফসোসের স্বরে বললো ফাহিমা।
পদ্মজা ফিক করে হেসে ফেললো। বললো,'পুলিশ হয়ে ক্রাইম কিংয়ের জন্য কাঁদছেন!'

তুষারের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কঠিন মনের তুষার ভেঙে পড়েছে! ভালোবাসার অনেক ব্যাখা সে শুনেছে। কিন্তু ভালোবাসা এমনও হতে পারে সে ভাবেনি। তুষার বললো,'তিনি অবশ্যই চেষ্টা করেছিলেন এই জগত থেকে বের হতে! কিন্তু পারেননি। তিনি আষ্ঠেপৃষ্টে পাপের রাজ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভালোবাসার কোনো আদালত থাকলে সেই আদালতে আমির হাওলাদারের সব খুন মাফ!'
পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে হাসে। অনেক কাহিনি, অনেক কান্না তো এখনও বাকি। এরা এইটুকুতে কেঁদে অস্থির! তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ভীষণ!

চলবে...
®ইলমা বেহারোজ
(এন্ডিং বেশি দেরি নেই। পরবর্তী পর্ব থেকে আমির-পদ্মজার দৃশ্য কমে যাবে। দুজন বেশিরভাগ আলাদা,আলাদা থাকবে। এবার অন্য চরিত্ররা আসবে।)

Kobitor.com